বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত
একটি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

ষোড়শ বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা | জানুয়ারী-মার্চ 1994 | পাঁচ টাকা

এই সংখ্যায় থাকছে

বিড়লার কারখানা পরিবেশ দূষণ করছে ডালটনগঞ্জে

মাল্টিন্যাশনাল বনাম কৃষক

সবুজ বিপ্লবের গোড়ার কথা

চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন

হাসপাতালের চালচিত্র

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বনাম জলাভূমি

চারপাশে যা দেখেছি

নর্মদার জলে টাকা ঢালবেন ?

সফল বনাম ব্যর্থ

আমাদের কথা

বেশ কিছুদিন হল রাস্তা-ঘাটে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা হলে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন 'কি হল, বি ও বি কি আর বেরোবে না ?' অনেক দিন পত্রিকা না পাওয়ার অভিযোগ জানিয়ে কয়েকটি চিঠিও এসেছে আমাদের দপ্তরে। সত্যিই তো, শেষ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল গত বছর বই-মেলার আগে। তাও সংখ্যাটা ছিল মার্চ-জুন '92-এর। অর্থাৎ, তখনই আমরা পিছিয়ে ছিলাম অনেকখানি। আর তারপর ? হ্যাঁ, স্বীকার করতে বাধা নেই, আমরা পারি নি। পারি নি আর কোনো সংখ্যা প্রকাশ করতে। নিজেদের দুর্বলতা, ব্যর্থতার দায়িত্ব নিতে আমরা দায়বদ্ধ। দায়বদ্ধ সেইসব মানুষের কাছেও, যাঁরা পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশ সত্ত্বেও সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, চাঁদা দিয়েছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন ছোট-বড় সব ব্যাপারেই।

আর এসবই আমাদের মধ্যে তৈরি করে এক অস্বস্তি। গণবিজ্ঞানের জগতে বন্ধুত্ব-সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি আমাদের ছোট্ট প্রয়াস যাতে বন্ধ না হয়ে যায় যাতে যোগাযোগের জায়গা আরও ছোট না হয়ে যায় তার জন্য আমাদের উদ্যোগকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদ আমাদের ভাবিয়েছে। চেষ্টা করেছি সমস্যাকে বোঝার, পথ খুঁজে বের করার।

প্রিয় বন্ধুরা, পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কিছু রদবদল ঘটিয়েছি আমাদের সাধ্য ও সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখে। প্রথমত জুলাই-আগষ্ট

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

লেখা বা রিপোর্ট পাঠানো বা অন্যান্য যে কোন কারণে যোগাযোগ—

(1) সুভাষ গাঙ্গুলী
বি—22/8, করুণাময়ী
হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক,
কলিকাতা—700 091
ফোন—359-0297

(2) অভিজিৎ লাহিড়ী
পি—252 লেক টাউন,
ব্লক-এ, কলিকাতা—700 089
ফোন—34-7982

'92 থেকে নভেম্বর-ডিসেম্বর '93 অবধি আমাদের সংগঠন, পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিরতির সময় অর্থাৎ ছুটির সময় হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যাটি জানুয়ারী '94-এ প্রকাশিত হচ্ছে ক্যালেন্ডারের সাথে সঙ্গতি রেখেই। দ্বিতীয় পরিবর্তন হল পরীক্ষামূলক ভাবে 1994 সালের জন্য আমরা পত্রিকা বছরে চারটি অর্থাৎ ত্রৈমাসিক হিসেবে বের করছি। অর্থাৎ নতুন হিসেবে এটি প্রথম সংখ্যা। আমাদের শক্তির সীমাবন্ধতার দিকে তাকিয়ে আমাদের এটা করতেই হচ্ছে। যাঁরা আগে চাঁদা দিয়েছেন তাঁদের আমরা পত্রিকা দিতে প্রতিশ্রুতিবন্ধ, কিন্তু নতুন গ্রাহকদের জন্য চাঁদার নতুন হার ধার্য করা হয়েছে। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানো হল। যদিও আকারে তা সামান্য ছোট হয়েছে। আশা করছি যে এসব পরিবর্তনের জন্য আপনাদের সহযোগিতা ও মতামত আমরা পাব।

বিরতির পর পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের তাকাতে হচ্ছে সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত দিকেই। পত্রিকার বিষয়, সংগঠনের অন্যান্য কাজকর্ম, টাকা-পয়সা, যোগাযোগ—সব ব্যাপারেই করার রয়েছে অনেক কিছুই। এ ব্যাপারে বিশেষ করে যেটা বলার তা হল এই প্রয়াসকে একটি যৌথ উদ্যোগ করে তোলার ক্ষেত্রে নানান বন্ধু ও বিভিন্ন সংগঠনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা। পুরোন বন্ধুরা তো রয়েছেনই, নতুন বন্ধুরাও আসছেন—তৈরী করতে সাহায্য করছেন ছোটখাট অনুসন্ধান মূলক লেখা, রিপোর্ট, অনুবাদ। শহর-মফস্বলের বিজ্ঞান গোষ্ঠী ও অন্যান্য সংগঠনের বন্ধুরা এনে দিচ্ছেন নতুন গ্রাহক, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তাঁদের এলাকার সমস্যার উপর অনুসন্ধানমূলক লেখা তৈরী করে দেবার। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি আগামীতে আমাদের সবার মিলিত অস্তিত্ব গড়ে তুলবে এক সুন্দর ছবি।

সূচীপত্র

আমাদের কথা—1 ☐ কস্টিক কারখানা ঃ পরিবেশ দূষণ / অসীম—3 ☐ কৃষকদের কারগিল আক্রমণ / শুভেন্দু দাশগুপ্ত—8 ☐ প্রযুক্তি এবং স্বনির্ভরতা ঃ ভারতীয় কৃষি কোন পথে? / অরূপ রতন মুখোপাধ্যায়—12 ☐ চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন / অমিতা—15 ☐ গণতন্ত্র / বিষ্ণু বিশ্বাস—22 ☐ পুকুর বোজানোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ / কাজল—24 ☐ ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স থেকে / অরুণ পাল—25 ☐ শ'-ওয়ালেশ কোম্পানীর গ্যাস / উত্তরপাড়া সাইন্স ক্লাব—27 ☐ সরকারী স্বাস্থ্য একটি সমীক্ষা—29 ☐ কিস্যা ক্যাকটাস অঁকিড কা / অনুবাদক কাজল রায়—33 ☐ জলা এলাকাতেই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার / র. চ.—35 ☐ নর্মদা বন্ড / র. চ.—37 ☐

কস্টিক কারখানা—পরিবেশ দূষণ

ডালটনগঞ্জে যা দেখেছি

[বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের শ্রমিক উদ্যোগের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করে 'নাগরিক মঞ্চ'। পাশাপাশি শিল্প-শ্রমিক-পরিবেশের ভারসাম্য নিয়েও তারা জানা ও বোঝার চেষ্টা করছে। নাগরিক মঞ্চের একটা ছ'জনের টীম ডালটনগঞ্জ গিয়েছিল '93 এর অক্টোবর মাসে। উদ্দেশ্য ছিল 34 কিলোমিটার দূরে গাড়ওয়া রোড স্টেশনের কাছে রেহেলার 'বিহার কস্টিক এ্যাণ্ড কেমিক্যালস লিমিটেড'-এর দূষণ সম্পর্কে এক অনুসন্ধান চালানো। এই প্রতিবেদনে ওই টীমের একজন সদস্য সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আকারে তার কিছু অভিজ্ঞতা জানাচ্ছে। মূল রিপোর্ট নাগরিক মঞ্চ ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে।]

* "আমার মনে হয় দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বড় একটা হয়না কারণ সাধারণভাবে দূষণের কুফল, সরাসরি খালি চোখে দেখা যায় না। আমরা জানছি যে কলকাতায় খুব পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। হাওয়ায় নাকি বিষ—কিন্তু সেই হাওয়াই দিনে প্রায় কুড়ি হাজার বার আমাদের দেহ, বাঁচার তাগিদে, বুকে টেনে নিচ্ছে। জলে নাকি বিষ—কিন্তু বালতি বালতি সেই জলই আমরা নিত্যদিন গিলছি। খুব জোরে মাইক বাজলে বলা হয় শব্দ দূষণ। আগে লোকে জানত খাবারে ভেজাল, এখন শোনা যাচ্ছে খাদ্য দূষণ। আমার সত্যি মনে হয় সাধারণ মানুষ আজকের 'তথ্য যুগে' অনেক কিছুই জানছে কিন্তু ঠিকঠিক বুঝতে পারছে না। তাদের কাছে 'সর্দি কাশির ধাত', 'অম্বল আমাশার ধাত' অনেক কাছের জিনিষ—তাই দূষণ তারা টের পাচ্ছে না। যতটুকু পাচ্ছে ততটুকু এখনও পর্যন্ত যেন বাড়তি অসুবিধে। ক্যান্সার বাড়ছে শুনলে অনেকেই বলে—আগে ধরা যেত না এখন ধরা পড়ছে—এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি। ভোপাল, তাই আজ এক দুর্ঘটনা মাত্র। দূষণ দুম করে ঘটলে সেটা দুর্ঘটনা, আস্তে আস্তে ঘটলে কোনো উৎসাহী সাংবাদিকের ভয় জড়ানো খবর বা বিজ্ঞানীর গবেষণা পত্র। কড়া বিষ খেলে মানুষ 'পত্রপাঠ' মারা যায়। আর দূষণের বিষ, তথ্য অনুযায়ী, আস্তে আস্তে মারে—শেষে স্বাভাবিক মৃত্যু না দূষণে মৃত্যু কোনো ডেথ সার্টিফিকেটে তা লেখা থাকে না। সরকারী সেনসাসে বলছে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। তাহলে দূষণ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কী এমন কারণ ঘটেছে কাগজ-কলমে পৃথিবীর অন্যতম দূষিত শহরের নাগরিকদের ?"

কথাগুলো ঠিক এভাবেই বলেছিলেন আমাদের এক বন্ধু। তাঁকে আমরা বলেছিলাম যে, বিহারের পালামৌ জেলায় রেহেলার কাছে বিহার কস্টিক এ্যাণ্ড কেমিক্যালস্ লিমিটেড (বি সি সি এল) নাকি ভয়ানক দূষণ ছড়াচ্ছে। পুজোর দিন কটায় অনুসন্ধান করতে তাই ওই অঞ্চলে যাচ্ছি

আমরা। তিনি শুনে বলেছিলেন "জায়গা আর সময় দুটোই চমৎকার—কাছেই বেতলা ফরেস্ট—ঘুরে এসো! আর অদৃশ্য দূষণ দেখে এসো!"

* বি সি সি এল কারখানায় তৈরি হয় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক সোডা, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর ক্লোরিন। '84 থেকে উৎপাদন চলছে। কারখানাটার প্রায় গোটাটাই অটোমেটিক। দিন মজুর নিয়ে মাত্র শ' চারেক শ্রমিক কাজ করে। বিহার সরকারের 51% আর বিড়লাদের 49% শেয়ার আছে, যদিও হাতে কলমে কাজ চলে বিড়লাদেরই দেখাশোনায়। বি সি সি এল-এর চারদিকে কাঁটা তারের বেড়ার পাশেই শুরু হয়ে গেছে তিনটে গ্রাম—গোরডিহা, ডাণ্ডিলা খুর্দ ও বিষ্ণুপুর। তারপরে একদিকে রেহেলা, অন্যদিকে সাবৌনা গ্রাম—আর একটু দূরেই রকশাহা ও সিগসিগি। এই সাতটা গ্রামে ঘোরা হয়েছিল, কথা বলা হয়েছিল গ্রামের মানুষদের সঙ্গে, কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল আর কলকাতার পরীক্ষাগারে মাপার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছিল বেশ কিছু জলের স্যাম্পেল।

* "আমাদের এই অঞ্চলকে এবার 'প্রায়-খরা' ঘোষণা করা হয়েছিল—এবছর তাই ফসল ভালোই হয়েছে—দেখছেন না, চারদিকে ক্ষেত কেমন সবুজ?" —খরার সময় ফসল ভালো? সব কেমন গুলিয়ে গেল। গ্রামের শিক্ষক আমাদের নিয়ে গেলেন রেহেলার পশ্চিম ধারে ট্রেন লাইনের পাশে—সেখানেই এই ধাঁধাঁর উত্তর পাওয়া গেল। বি সি সি এল-এ তৈরি হওয়া কস্টিক সোডা ট্রাকে করে এনে এখানে একটা বড় ট্যাঙ্কে রাখা হয়। পরে তা ভরা হয় ট্রেনের ওয়াগনে। উপচে পড়া কস্টিক সোডা জমা হয় একটা কাটা পুকুরে। এই পুকুর থেকে কস্টিক সোডা চুঁইয়ে আসে আশে পাশে, সেখান থেকে ফসলের জমিতে। এই ভাবে কালো করোসিভ কস্টিক এমনিতেই বরবাদ করছে ধানি জমি কিন্তু বৃষ্টি হলে এই পুকুর উপচে ভরিয়ে দেয় অনেকটা ক্ষেত আর তাই ফসল তখন প্রায় হয়ইনা। এ বছর বৃষ্টি কম হয়েছে, তাই কস্টিক-পুকুর উপচোয়নি, তাই ফসল অন্য বারের চেয়ে ভালোই।

এই কস্টিক-পুকুরের ধারে আর কাছের ধানি জমির মধ্যে মধ্যে সব মিলিয়ে কয়েক একর উর্বর জমি আজ কুচকুচে কালো—কস্টিক সোডার প্রভাবে এই সব জমি এমনটাই হয়ত থাকবে আরো কয়েক দশক। কিন্তু যেটা এখানে আরো ভয়ানক তা হল এই তথ্য যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রাথমিক ফল অনুযায়ী দেখা গেছে যে এই কস্টিক সোডার সঙ্গে কারখানা থেকেই মিশে আছে ক্ষতিকর পরিমাণে মারাত্মক মারকারি বা পারদ।

রেহেলা গ্রামের দীক্ষিত টোলা ও ডাবগড় মহল্লায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য অনুসন্ধান থেকে দেখা যাচ্ছে যে কয়েক ধরনের অসুখ এ অঞ্চলে অস্বাভাবিক রকমের বেশি যেমন—চুলকানি, দাঁতের অসুখ, পেটের গণ্ডগোল, পেট জ্বালা। সন্তান না হওয়া ও গর্ভপাত, অনিদ্রা, বিরক্তি, হাতের লেখা হঠাৎই খারাপ হয়ে যাওয়া, বাচ্চাদের বেশি বয়স পর্যন্ত কথা বলতে বা হাঁটতে না পারা ইত্যাদিও বেশ ভালো রকম চোখে পড়েছে।

* ডাবগড় মহল্লাতে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল বিশ পঁচিশ জন গ্রামের মানুষের সঙ্গে। হঠাৎই আমাদের চমকে দিয়ে তারা যেন যে যেদিকে পারে দৌড়তে শুরু করলো। আমাদের অবস্থা দেখে গ্রামের এক বৃদ্ধ জানালেন "বিড়লাদের জলের গাড়ী আসছে—দিনে দু তিনবার আসে—ঘর পিছু চার পাঁচ বালতি জোটে রোজ—ওই দিয়েই চালাতে হয়। লেখালেখি, দরবার, শেষে 'চাক্কা জ্যাম' করার পর ওরা এই জল দিচ্ছে। গ্রামের শ' দেড়েক চাপা কল, কুয়ো তো থেকেও নেই। সব জলই নোনতা হয়ে গেছে—মুখে দিলে বমি উঠে আসে। এভাবেই চলছে গত ছ'সাত বছর। এর মূলে ওই স্টেশনের নুনের বস্তাগুলো।"

বি সি সি এল-এর প্রধান কাঁচা মাল হচ্ছে গুজরাটের নুন। গাড়ওয়া রোড স্টেশনে মাল গাড়ী ভর্তি নুনের বস্তা খালাস করা হয় খোলা আকাশের নীচে—স্টেশনের পাশের খালি জমিতে। পুরো অঞ্চলটা দু'তিন ইঞ্চি মোটা নুনের আস্তরণে ঢাকা। এই নুন বৃষ্টির জলে মাটির তলায় চলে গিয়ে মিশে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ জলে। ফলে চাপাকল বা কুঁয়োর জল মুখে দেওয়া যায় না।

ঠিক একই অবস্থা হয়েছে স্টেশনের অন্য পারে বিষ্ণুপুর গ্রামের পঁচিশটা চাপাকল ও কুঁয়োর। ওখানেও জল সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে বি সি সি এল। একটা সরু পাইপ থেকে জল আসছে—সেটাই ব্যবহার করছে গ্রামের পাঁচশ মানুষ।

কুঁয়োর বা চাপাকলের জলেও পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে ক্ষতিকর পরিমাণে সেই বিষাক্ত মারকারি বা পারদ।

* "ওটাকে নালা বলবেন না! ওটা ভেলোয়া নদী, কোয়েলে গিয়ে পড়েছে। আমাদের এই গোরাডিহা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যেত এই নদী—সব জলের কাজ আমরা ভেলোয়া থেকেই করতাম। ছোট দেখতে কিন্তু জানেন কাঠ ফাটা গরমে কোয়েল প্রায় শুকিয়ে গেলেও ভেলোয়াতে তখনও চান করা যেত। আচ্ছা আপনারা বলুনতো, বি সি সি এল নদী নিয়ে নিতে পারে আমাদের জীবন থেকে?"

সত্যি তাই ঘটেছে। বি সি সি এল জমি কিনেছে ভেলোয়া নদীর দুপারে। তারপর 'নিজেদের' জমি এক জোড়া তার-কাঁটার উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। ফলে ভেলোয়া নদীটাও যেন বি সি সি এল-এর। গ্রামের মানুষ আর তা ব্যবহার করতে পারছে না। কিন্তু বি সি সি এল এই প্রাকৃতিক নদীটাকে শুধু যে তারকাঁটার জালে জড়িয়ে নিয়েছে তাই নয় তাতে ফেলছে শিল্পের যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ।

"যেখান থেকে ভেলোয়া ওদের বেড়া পেরিয়ে কোয়েল নদীর দিকে যাচ্ছে সেখানে নদীর রং খয়ের গোলার মতন—আর সেঁক ঝাঁঝ! ওরা নদীটাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে মেরে ফেলেছে। ওরা এখন ভেলোয়াকে বলে 'নালা'।"

* "আমরা বলি বিড়লা গ্যাস। এক বছর আগে পর্যন্ত যখন তখন ছাড়ত ওরা। গ্যাস যখন নীচের দিকে নামত, তার মধ্যে যারা পড়ত তারা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেত। গ্যাস যেদিক দিয়ে যাবে সমস্ত কিছু—মানে ফসল, গাছের পাতা সবজি ক্ষেত সব কিছু জ্বালিয়ে দেবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু হলদে হয়ে শুকিয়ে যাবে। আর গ্রামের মানুষের সর্দি হবে, হাঁপানি হবে, চোখে জল পড়বে। অনেক সময় আমরা ঘর ছেড়ে পালিয়েছি। এখনও বিড়লা গ্যাস ছাড়ে কিন্তু বেশিটাই রাতের দিকে—অল্প অল্প করে। আপনারা আজ যদি ভোরের দিকে আসতেন তাহলেও কাশি আর চোখ জ্বালা টের পেতেন।"

এই একই কথা অন্ততঃ দশজনের মুখে আমরা শুনলাম সারৌনা, রকশাহা ও সিগসিগি গ্রামে। এখানকার কুঁয়ো বা চাপাকলের জলে নুন নেই—ক্ষেত কস্টিক সোডায় জ্বলে যাচ্ছে না কিন্তু কোন ফসল যে কখন জ্বলে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। এই বিড়লা গ্যাস আসলে ক্লোরিন। এই গ্যাস বি সি সি এল-এ তৈরি হয় কিন্তু তা যতটা প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি জমে গেলে, খরচ কমাতে, কর্তৃপক্ষ বাতাসে সেটা ছেড়ে দেয়। ফলে আশ পাশের গ্রামগুলোতে নিশ্বাসের কষ্ট, সর্দিকাশি, হাঁপানি, টি বি যেন মহামারীর আকার ধারণ করেছে—কৃষি কাজ হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত।

* ডাণ্ডিলা খুর্দ গ্রামে বসে দেখছিলাম সামনে একটা বিশাল ফাঁকা জমি আর তার ঠিক পরেই ঝকঝকে বি সি সি এল কারখানার যন্ত্রপাতি।

—"জানেন আমাদেরই ধানি জমি কিনে ওই দৈত্যটা তৈরী করেছে ওরা? সরকার ও বিড়লার লোকেরা কথা দিয়েছিল প্রতিটা পরিবার পিছু এক জনের চাকরি হবে ওই কারখানাতে।

এখন সাতটা গ্রামের মোট কুড়িজনও চাকরি পায়নি। অবশ্য তখন জানতাম দেশলাই না ইস্পাত কারখানা হবে। ওটা দৈত্যই—ওর নিশ্বাসে বিষ আছে।—কী একটা সাদা ধোঁয়া মতন ছাড়ে যেটা ফসল বা জমিতে মিশে যায়। তারপর যদি এক পশলা বৃষ্টি আসে, মেঘের মতন কী একটা উঠতে থাকে। ব্যাস, তাহলেই ফসল ও জমি বরবাদ হল বলে আমরা ধরে নিই। এভাবে আমাদের দশ একর মতন জমি পতিত হয়ে পড়ে আছে—আর বছর বছর তা বাড়ছে।"

ওই বিশাল ফাঁকা জমিটাতে ভালো ঘাসও হয় না। সাদা ধোঁয়াটা আসলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বাষ্প। ফলে লিক হলে বা অতিরিক্ত পরিমাণে বেরিয়ে পড়লে পশ্চিমী হাওয়া কাঁটা তারের বেড়া পেরিয়ে জমিতে নিয়ে গিয়ে ফেলে। চার দিকে ধানক্ষেতের মাঝে ওই রকম ফাঁকা রুক্ষ বিশাল জমি খুব অবাক করে।

* কোয়েল নদীর ধারে সিগসিগি গ্রামে প্রায় একশ ঘর 'মাল্লা' পরিবার থাকেন। তাঁদেরই একজন বললেন "আমাদের পেশা মাছ ধরা আর দাঁড় বাওয়া। সরকারের কাছ থেকে মাছ ধরার পারমিট নিতাম—প্রতিদিন কোয়েল থেকে দেড়-দু কুইন্টাল মাছ উঠত শুধু আমাদেরই গ্রাম থেকে। দূর দূর শহরে সে মাছ চালান যেত। কিন্তু যেদিন থেকে বিড়লা কারখানা চালু হয়েছে সেদিন থেকে মাছ তো দূরের কথা কোয়েলে আজ ব্যাঙও পাবেন না। শুধু এখানে নয়—35 কিলোমিটার নীচে মহম্মদগঞ্জ ব্যারেজ পর্যন্ত একই হাল। বি সি সি এল ভেলোয়া দিয়ে কোয়েলেও বিষ মেশাচ্ছে।"

সিগসিগিতে চর্মরোগ খুব বেশি চোখে পড়ল। জিজ্ঞেস করতে গ্রামবাসীরা জানাল যে এমনিতে চাপাকলের জলই ব্যবহার করা হয় ঠিকই—কিন্তু নদীতে চান করা একেবারে ছেড়ে দেওয়া কঠিন। চিরকালের অভ্যেস—মাঝে মধ্যে চান করেই সকলে। সিগসিগি বি সি সি এল থেকে নদী পথে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। —"চান করা যে উচিত নয় তা আমরা জানি—জল কম থাকলে আমরা সাইকেল ঠেলে নদী পার হতাম। এখন নতুন সাইকেলের রিম পর্যন্ত দু তিন দিন কোয়েলের জল লাগলে মরচে ধরে যায় জানেন। তবু চুলকানি ছাড়া আর তো কিছু হচ্ছে না? এখন মাঝে মাঝে তাই শুধু চান করি—"

নদী এদের জীবনে অনেকটা জায়গা নিয়ে থাকে। কিন্তু বি সি সি এল-এর দূষণের ফলে সিগসিগির কোয়েলে মারকারি থেকে শুরু করে অনেক ধরণের ক্ষতিকর পদার্থ আছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই গ্রামে গর্ভপাতের সংখ্যা বেড়েছে; বাচ্চারা তিন বছর পর্যন্ত কথা বলতে বা হাঁটতে পারছে না; কারোর কারোর মুখ বেঁকে যাচ্ছে; আগের তুলনায় বেশি সংখ্যায় বাচ্চাদের হাত পা সরু হয়ে যাচ্ছে বলে গ্রামের লোক মনে করছেন।

* বি সি সি এল-এর কাঁটা তারের বেড়া পেরিয়ে ভেলোয়া একটা রেল ব্রীজের তলা দিয়ে আধ কিলোমিটার গিয়ে কোয়েলে পড়ছে। আমরা চমকে গেছিলাম ভেলোয়ার বুক থেকে উঠে আসা রেলব্রীজের থামগুলো দেখে। ভেলোয়ার জলে ক্ষয়ে গেছে থামগুলো। জলের তলের কাছে এ গুলো দুতিন ইঞ্চি গভীর হয়ে গেছে। নদীর জলে বা পাড়ের বড় বড় পাথরগুলো ঝামার মতন হয়ে গেছে। পা হাঁটা সাঁকোর ধারে মাটিতে সোজাসুজি গাঁথা ট্রেনের ইস্পাতের একটা লাইনের অংশ হয়ে উঠেছে লালচে আর মুচমুচে। রেল ব্রীজের থামগুলো যে ক্রমাগত কমজোরী হয়ে পড়ছে তার যথেষ্ট লক্ষণও দেখা দিচ্ছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে বি সি সি এল এই ভেলোয়া নদীতে সমস্ত শিল্প বর্জ্য ছেড়ে দেয়।

* প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে দেখা যাচ্ছে জল ও বায়ু দূষণ ভয়াবহ রকমের হচ্ছে। সব চাইতে বিপজ্জনক এই যে বি সি সি এল এমন এক প্রক্রিয়ায় কস্টিক সোডা তৈরি করছে যাতে নদীর জল, ভূগর্ভের জল, মাটি,

ফসল, ঘাস ইত্যাদিতে মিশে যাচ্ছে ভয়াবহ মারকারি বা পারদ।

অন্যদিকে এটাও ঘটনা যে ভেলোয়া, কোয়েল, সোন হয়ে গঙ্গাও দূষিত করছে রেহেলার এই বি সি সি এল কারখানা।

গ্রামের পথে হঠাৎই আমাদের রাস্তা আটকে দিলেন এক খাদি পরা জননেতা। তিনি প্রাথমিক কিছু কথার পর বললেন—"শুনুন আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। দেশকে আজ এগিয়ে যেতে হলে এই ধরনের কোটি কোটি টাকার কারখানা বানাতেই হবে। আর তার কিছু কু-প্রভাব পড়বেই স্থানীয় মানুষের ওপর। জানেন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালো হচ্ছে এই কারখানার জন্যে—তার জন্য এখানকার 20-25 হাজার মানুষের কষ্ট তো আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমিও এই গ্রামেই থাকি, আমারও জমি উজাড় হচ্ছে—কিন্তু তা বলে কি আমরা চাইব না দেশ এগিয়ে যাক? আমরা কি লাঠিসোটা নিয়ে কারখানা বন্ধ করবো? না তা কখনই নয়। তাই আমরা চেষ্টা করবো কিছু চাকরি, চাপা কল, কিছু ক্ষতিপূরণ, মন্দির, এইসব যাতে আমাদের গ্রামগুলো পায়। —শুনছিলাম কলকাতা থেকে কিছু সি আই ডি এসেছে তাই নিজেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"···

সাধারণভাবে যাদের সঙ্গেই কথা হয়েছে তারাই মন খুলে কথা বলেছে। নিজেদের অসুবিধে জানিয়েছে ক্ষোভের সঙ্গে। অনেকেই বলেছে "আমাদের জন্যে কে ভাবে বলুন তো? গরীবদের তো কেউই নেই আর আমরা ওদের বিরুদ্ধে কীইবা করতে পারি?"

একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট—আমাদের ঘোরা এই সাতটা গ্রামের হাজার সতেরো মানুষ বোধহয় সবাই জানে যে দূষণ হচ্ছে—তারা দেখতে পাচ্ছে যে বি সি সি এল দূষণ করছে—তারা বুঝছে যে তাদের শরীরে বিষ ঢুকছে—দূষণ তাদের কাছে অসুবিধে নয় সত্যিই অত্যাচার—কিন্তু তবু এক এক করে ন'টা বছর কেটে গেছে।

ক্রোধ আছে, রাগ আছে দূষণের বিরুদ্ধে—কিন্তু পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত আছে একটা হাল ছেড়ে দেওয়া নিষ্ক্রিয়তাও। আজকের হার মানা এই সচেতন মানুষগুলো কিন্তু দলে ভারি—যেন তারা কিছুর অপেক্ষায়ও।

□ **অসীম**

[এই প্রসঙ্গে আরও তথ্যর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

নাগরিক মঞ্চ
রুম নং ৭, ব্লক বি
১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কলকাতা-৮৫।]

বিতর্কিত বিষয়—সম্প্রতি পরিবেশ দূষণের অপরাধে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে শাস্তি পেতে চলেছে বেশ কয়েকটি কারখানা। ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে না পারায় বন্ধ হয়ে গেছে একাধিক কারখানা। এইসব ঘটনা আজ সামনে নিয়ে আসছে নানান প্রশ্ন, শ্রমিকের রুটি-রুজি না পরিবেশের উন্নতি—এইভাবেই হয়ত দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে দুটি পক্ষ। আমরা চাই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মীতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হক বিষয়টির সমস্ত দিক নিয়ে। আমাদের আবেদন—এ প্রসঙ্গে লেখা পাঠান, মতামত দিন।

কৃষকদের কারগিল আক্রমণ

প্রসঙ্গ কৃষি : এক

বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভারতে নতুন কিছু নয়। বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন বলছেন, লিখেছেন লিখছেন। রাজনীতির লোকেরা যেখানে যেখানে বললে সুবিধা হয়, বলে চলেছেন। যারা শ্রমিকদের দেখভাল করার দায়িত্ব নিয়েছেন তারা সামলে সুমলে বলেন। খুব এগিয়ে কিছু করলে বহুজাতিক কোম্পানীর কারখানা বন্ধ করে দিতে হয়। তাহলে শ্রমিকরা খাবে কি? আর সরকারে যারা আছে সে কেন্দ্র কিংবা রাজ্যে হোক, এবং যারা তাদের দরকারে অদরকারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের তো বেজায় মুস্কিল। তারা তো অর্থনীতিক সংকট বলতে বোঝায় বিদেশী পুঁজির ভাঁড়ারে টান। আর তাদের ধারণা বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে এদেশে কাজ করতে দিলে বিদেশী পুঁজির ভান্ডার ভরে উঠবে।

এই অবস্থাটা বদলে দিলেন কর্ণাটকের কৃষকরা। সরাসরি আক্রমণ করলেন একটা বহুজাতিক কোম্পানী কারগিলের দপ্তরে ও খামারে। 1992 সালের 29 ডিসেম্বর কৃষক সংগঠন কর্ণাটক রাজ্য রাইথা সংঘের সদস্যরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক সংস্থা কারগিল ইনকরপোরেটেডের ভারতীয় সহযোগী সংস্থা কারগিল সীডস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের দপ্তরে প্রতিবাদ জানিয়ে ভাঙচুর করে। ক্ষুব্ধ কৃষকরা কাগজপত্র নষ্ট করে দেয়। তারমধ্যে ছিল গত চার বছর ধরে ভারতে কারগিলের গবেষণা সংক্রান্ত ও তাদের বিনিয়োগ পরিকল্পনায় সরকারী সম্মতি বিষয়ক কাগজপত্র। রাইথা সংঘের এই কাজে সহায়ক সংগঠন ছিল জিন ক্যাম্পেন।

এরপর 12 জুলাই 1993 রাইথা সংঘের সদস্যরা কর্ণাটকের বেলারিতে কারগিলের বীজকেন্দ্র ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেয়।

কর্ণাটক রাজ্য রাইথা সংঘ কৃষকদের সংগঠন। কর্ণাটকের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা লক্ষাধিক। জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফের সভায় চলতে থাকা কৃষি সংক্রান্ত আলোচনার গতি প্রকৃতি এরা মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তারা বিজ্ঞানীদের কাছে জানতে চেয়েছেন। বুঝতে চেয়েছেন ভারতের কৃষির ওপর ডাঙ্কেল প্রস্তাবের প্রভাব। একবছর ধরে কর্মীদের জন্য আলোচনা শিবিরের ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তারা নিজেরাই এ বিষয়ে যথেষ্ট জেনে নিতে পারে।

সামগ্রিক কর্মসূচী হিসাবে রাইথা সংঘ ঘোষণা করেছে 'বীজ সত্যাগ্রহ'। বহুজাতিক সংস্থার আক্রমণ থেকে দেশের কৃষি বিশেষত বীজকে বাঁচানোর জন্য সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কারগিলের দপ্তর ও বীজকেন্দ্র আক্রমণ করা হয়েছে। ভারতের বীজের ক্ষেত্রে যে 11টি বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাদেরকে 'ভারত ছাড়ো' বিজ্ঞপ্তি জারী করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে কারগিল ছাড়া মার্ক, পাওনিয়ার হাইব্রেড, সিবা গাইগি, স্যান্ডোজ, কন্টিনেন্টাল সিড, হেক্সট এই সব।

বহুজাতিক সংস্থাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই আন্দোলনের কারণ নিছক বহুজাতিক সংস্থা নয়। এর

সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো কয়েকটা বড় বিষয়।

যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। কৃষকদের ধারণা আমেরিকা ভারতকে চাপ দিচ্ছে ভারতের পেটেণ্ট আইন বদলানোর জন্য, যাতে তাদের বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এদেশে বাজার দখল করতে পারে।

যেমন, জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অফ ট্রেড এ্যাণ্ড ট্যারিফের (গ্যাট) আলোচনা। গ্যাটের আলোচনার আওতায় এবার নিয়ে আসা হয়েছিল মানুষের জ্ঞানকে সম্পত্তি হিসাবে ধরার ধারণা। এর উদ্দেশ্য হল প্রাণের যে কোনো আকারের উপর মালিকানা সত্ব জারী করা, তৃতীয় বিশ্বের জীবকোষ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, তৃতীয় বিশ্বের বাজার দখল করা।

যেমন, সরকারের কৃষিনীতি। বর্তমান কৃষিনীতিতে ভারতের কৃষিকে বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যবস্থায় বহুজাতিক সংস্থার রাজত্ব। কৃষকদের মত, বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশ ভারতের কৃষিতে কোনো উন্নতি আনবে না। বরং ভারতকে ঠেলে দেবে 60-এর দশকে আমেরিকার পি এল 480-র আওতায় অপমানজনক খাদ্য সাহায্যের সময়কার অবস্থায়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের প্রতিবাদ বিষয়ে সরকারের অনীহা।

এই সব সাধারণ বিষয় ছাড়া রয়েছে নির্দিষ্ট বিষয়ঃ বহুজাতিক সংস্থা। কর্ণাটক রাজ্য রাইথা সংঘ এবং জিন ক্যাম্পেন প্রাণের উপর মালিকানা সংক্রান্ত যে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির বিরোধী। এদের মতে, জীবনের যে কোন রূপের উপর ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার পরিপন্থী। এই অধিকারের ফলে বহুজাতিক সংস্থার জীব, জৈব সার, জৈব কীটনাশক এসবের নতুন বাজার তৈরী হবে। আর্থিক ক্ষমতাবান বহুজাতিক কোম্পানীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে দেশের কৃষকদের ও বিজ্ঞান সংস্থাগুলোকে। এর ফলে জীবকোষ সম্পদের ক্ষেত্রে দেশ আরেকবার উপনিবেশে পরিণত হবে। কৃষির ক্ষেত্রে স্বদেশী কারিগরীর অগ্রগতি সম্পূর্ণ আটকে যাবে জীবকোষ সংক্রান্ত তথ্যের অভাবে। কারণ তথ্যগুলো পেটেন্টের মাধ্যমে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর দখলে থাকবে।

সামগ্রিকভাবে বহুজাতিক সংস্থা থেকে নির্দিষ্টভাবে কারগিল। রাইথা সঙ্ঘের মতে, বীজের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে সব বহুজাতিক সংস্থা ভারতের কৃষির উপর নজর দিয়েছে কারগিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। কারগিলের ক্ষমতার আন্দাজ দেওয়া হয়েছে কয়েকটা তথ্যের মাধ্যমে। যেমন-

1. কারগিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় শস্য ব্যবসায়ী, পৃথিবীর বড় বীজ ব্যবসায়ীদের তালিকায় এদের স্থান পাঁচ নম্বরে।

2, যে সব জিনিস নিয়ে এরা ব্যবসা করে তাহল বীজ, লবণ, পশু খাদ্য, মুরগি ও ডিম, কৃষি যন্ত্রপাতি, কয়লা, ইস্পাত, তৈল বীজ, সার। সাইট্রিক এসিড, শস্যদানা ভাঙ্গানো, তৈল শোধনাগার এই সব।

3. যে সব দেশে এদের ব্যবসা আছে তার তালিকায় রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেণ্টিনা, ব্রাজিল, ফ্রান্স, মেক্সিকো, তানজানিয়া, ফিলিপাইনস্, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, বেলজিয়াম, জার্মানী, গুয়াতেমালা, এল সালভাদোর, দক্ষিণ কোরিয়া, ইংল্যাণ্ড, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্।

4. কারগিলের গবেষণার বাজেটের পরিমাণ ভারতের জাতীয় বাজেটের পরিমাণের চার গুণ। ভারতের মতো দেশগুলোতে এদের ব্যবসার রকমসকমের একটা উদাহরণঃ নাইজিরিয়াতে 1988 সাল পর্যন্ত প্রচুর গম আমদানি করা হত আর কারগিল ছিল তার প্রধান সরবরাহকারী। গম আমদানির ফলে নাইজিরিয়ার নিজস্ব খাদ্য শস্য কাসাডা, ইয়ামস ও বাজরার উৎপাদন কমে যায়। নিজেদের শস্য বাঁচাতে নাইজিরিয়া সরকার 1988 সালে গম

আমদানি বন্ধ করে দেয়। কারগিলের ব্যবসায় হাত পড়ে। কারগিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে দরবার করে। আমেরিকা নাইজিরিয়া থেকে কাপড় আমদানি বন্ধ করে দেয়।

কারগিল ভারতে কি করতে চায় তা যতটুকু জানা গেছে তা এই রকম ঃ

কারগিল সীডস্ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড 1988 সালে স্থাপিত একটা যৌথ উদ্যোগ। অংশগ্রহণকারী সংস্থা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কারগিল ইনকরপোরেটেড-শেয়ার পুঁজিতে এদের অংশ শতকরা 52 ভাগ। সহযোগী সংস্থা টেডকো কোম্পানী, নিউ দিল্লী। এরা জোয়ার ও সূর্যমুখী নিয়ে গবেষণা করবে। 1992 সালে এই সংস্থা শংকর জাতীয় তৈলবীজ 'অ্যাডভান্স' ভারতের বাজারে বিক্রি করা শুরু করেছে। বাজারে বিক্রির দায়িত্ব নিয়েছে টাটার সংস্থা র‍্যালিস ইন্ডিয়া। এরা কারগিলের সমস্ত উৎপাদনের বিতরণের স্বত্ব লাভ করেছে। কারগিল সীডসের লক্ষ্য চারটি শস্য-সূর্যমুখী, ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরা। এরা ভারতে পশুখাদ্যের জন্য একটা বিশেষ ধরনের ভুট্টা তৈরী করবে সরকার স্বীকৃত একটা সংস্থা কর্ণাটক মেইজ ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশনের মাধ্যমে। এই সংস্থাটি কারগিলের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ইন্ডিয়া মেইজ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত। পশুখাদ্য নিয়ে কারগিলের বিরাট বিশ্ববাণিজ্য রয়েছে। কারগিল ভারতে বীজ তৈরী করবে না। এরা একদল ভারতীয় কৃষকদের দিয়ে বীজ তৈরী করিয়ে নিয়ে অন্য দল কৃষকদের কাছে বিক্রি করবে। কর্ণাটকের বেল্লারিতে সূর্যমুখী উৎপাদনে 7 কোটি টাকা ব্যয় করেছে ভারতে সূর্যমুখীর বাজারের 25 শতাংশ দখল করার উদ্দেশে।

রাইথা সংঘের কারগিলের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ হল এদের বীজের কার্যকারিতা সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার। কারগিলের সূর্যমুখী বীজের দাম প্রতি 3 কেজি 540 টাকা। এদের প্রচার যে প্রতি একরে 16 কুইন্টাল উৎপাদন হবে। সংঘের সক্রিয় সদস্যরা কর্ণাটকের 10টি জেলায় এই বীজ ব্যবহার করে দেখেছেন যে উৎপাদন হয়েছে 5 কুইন্টালের বেশি নয়। তাও 4 কুইন্টাল সার লাগিয়ে। অন্যদিকে স্থানীয় বীজ ব্যবহার করে প্রতি একরে পাওয়া গেছে 8 কুইন্টাল উৎপাদন, 1 কুইন্টাল সার ব্যবহার করে। দেশী বীজের দাম তুলনায় অনেক কম। প্রতি 3 কেজি 250 টাকা। এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে রাইচুর, ধারওয়ার, বেলগাঁও, বেল্লারি, চিত্রদুর্গা, সিমোগা ও টুমকুর জেলা থেকে।

নির্দিষ্টভাবে কারগিল থেকে সাধারণভাবে কৃষিতে বহুজাতিক সংস্থার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাইথা সংঘের বক্তব্য, এদের উপস্থিতির ফলে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নত জমিগুলোকে খাদ্য উৎপাদন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অত্যধিক রাসায়নিক প্রয়োগে জমি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এদের কাজকর্মের ফলে দেশগুলো খাদ্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরতার অবস্থা থেকে খাদ্য আমদানিকারকে পরিণত হয়েছে।

সংঘের সভাপতির মতে, কারগিলের মতো বহুজাতিক সংস্থারা ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কৃষি স্বাধীনতা ধ্বংস করে দেবে। এদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের নৈতিক বিষয় হলো জ্ঞানের উপর, প্রাণের রূপের উপর, দেশজ ধারার জীবকোষের উপর মালিকানা স্বত্বের বিরোধিতা। এই স্বত্ব অনৈতিক, প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

কর্ণাটক রাজ্য রাইথা সংঘের কারগিলকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেবার কারণ, বীজের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে সব বহুজাতিক সংস্থা ভারতের কৃষির উপর নজর দিয়েছে, কারগিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এর পরের লক্ষ্য আই টি সি যারা বহুজাতিক সংস্থা কনটিনেনটাল গ্রেন-এর সহযোগিতায় বীজের ব্যবসা শুরু করেছে।

রাইথা সংঘের কর্মসূচীকে নিন্দে করেছে ভারত সরকার, ভারতে আমেরিকার দূতাবাস এবং কারগিল সীডসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানিয়েছে, এই ধরনের আন্দোলনের ফলে কারগিল পিছিয়ে যাবে না। তাদের সংস্থা ভারতের কৃষিতে যথেষ্ট বড় এক ভূমিকা রাখবে।

অন্যদিকে রাইথা সংঘ এবং জিন ক্যাম্পেন অন্যান্য কৃষক সংগঠনের সহযোগিতায় তাদের প্রচারের ভূগোল বাড়াবার চেষ্টা করছেন।

1993-র 3 মার্চ দিল্লীর লালকেল্লা ময়দানে কৃষকদের এক প্রতিবাদ সভা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, দিল্লী, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় 50 হাজার কৃষক সেখানে হাজির হয়েছিলেন। কর্ণাটক থেকে 1 হাজার মহিলা 'কৃষক' এসেছিলেন। সভায় বিভিন্ন সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়, যেমন ব্যাংকিং ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়া। সভার মতে ভারতের অর্থনীতিতে আই এম এফ বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তাব আসলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিদেশী লুঠের প্রস্তাব। ভারতে খাদ্য আমদানির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হয়। বলা হয় দেশের উর্বর জমি বহুজাতিক সংস্থাকে হস্তান্তর করতে দেওয়া হবে না, ইত্যাদি।

কর্ণাটক রাইথা সংঘ ও জিন ক্যাম্পেন সংস্থার কৃষক সদস্যদের কারগিলের দপ্তর ও বীজকেন্দ্র আক্রমণের মধ্যে দিয়ে বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে যাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই পাবার নেই সেই কৃষকরা সরাসরি আক্রমণের পথ বেছে নিয়েছে। সরকার, রাজনীতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদ এখানে হেরে গিয়েছে।

☐ শুভেন্দু দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র :

1. সীডস্ অফ প্রটেস্ট, পাবলিক ইন্টারেস্ট রিসার্চ গ্রুপ, দিল্লী 1993।
2. ফারমার এগেনস্ট ডাঙ্কেল, পাবলিক ইন্টারেস্ট রিসার্চ গ্রুপ, দিল্লী।
3. বন্দনা শিবা, 'কুইট ইন্ডিয়া : ইন্ডিয়ান ফারমার বার্ন কারগিল প্লান্ট এন্ড সেন্ড মেসেজ টু মালটিন্যাশনাল' থার্ড ওয়ার্ল্ড রিসারজেন্স, ইস্যু নং 36, অগাস্ট 1993.

একটি আবেদন—কারগিল কর্পোরেশনের ঘটনা এবং সাধারণভাবে বীজ নিয়ে বহুজাতিক সংস্থার দখলদারী সংক্রান্ত দুটি লেখা পড়ার পরে এ প্রশ্ন মনে আসতেই পারে, যে আমাদের চারপাশের দুনিয়ায় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বীজ পরিস্থিতি কি রকম ? দেশী বীজ ব্যবহার করা প্রসঙ্গে এখানকার মানুষ কি ভাবছেন ? এবং এর সাথে সম্পর্কিত আরও সাত সতের প্রশ্ন। আমাদের দুর্বলতা এখানেই যে আমরা এসব নিয়ে জানি বড় কম। তাই যদি এ প্রসঙ্গে কেউ কোন লেখা বা রিপোর্ট বি ও বি'র মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান তবে তা আমাদের কাছে খুবই কাম্য।

প্রযুক্তি এবং স্বনির্ভরতা

প্রসঙ্গ কৃষি ঃ দুই

ভারতীয় কৃষি কোন পথে ?

ভারতের কৃষিতে উচ্চফলনশীল বীজ প্রযুক্তি শুরু হয় ষাটের দশকে। সার্বিক চাষবাসের সঙ্গে এই প্রযুক্তির পার্থক্য শুরু থেকেই। সার্বিক দেশজ কৃষি ভাবনায় কৃষির সঙ্গে প্রকৃতির সহঅবস্থানই গুরুত্ব বেশী পাচ্ছিল এতদিন। উচ্চফলনশীল প্রযুক্তি এগিয়ে এলো নতুন লক্ষ্য নিয়ে—প্রকৃতির বৈচিত্রের বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন করে, যথাসম্ভব প্রাকৃতিক সম্পদকে নিংড়ে নিয়ে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে। বাস্তবিক, ঐ সময় থেকেই ফোর্ড রকফেলার ফাউণ্ডেশন প্রবর্তিত 'সবুজ বিপ্লব' আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে দেশজ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যভিত্তিক অবস্থান থেকে বিদেশ-জাত এবং আধুনিক উপাদান যোগান ভিত্তিক অবস্থানে রূপান্তরিত করেছে, উৎপাদন হয়েছে বাজারমুখী এবং বীজ পরিণত হয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান থেকে পণ্যে। এভাবে গড়ে উঠেছে কৃষি উৎপাদনের সহযোগী উপাদানের এক সংগঠিত বাজার—বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি, জল, ডিজেল এবং যন্ত্রপাতির তথা আধুনিক প্রযুক্তির। এই কৃষি প্রযুক্তির প্রধান উপাদান হলো উচ্চফলনশীল বীজের বাজার তৈরী করা, কৃষককে বীজের জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীল করা—এর উপরই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে বহুজাতিক সংস্থাগুলির সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার তথা ব্যবসা, এর মধ্যেই সুপ্ত এদেশে বাজার বিস্তারের বিরাট সম্ভাবনা।[1]

ফিরে দেখা

1956 থেকে ভারতীয় নেতা, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, ছাত্রদের ঢালাও ভাবে আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থা দেখা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া শুরু হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীগণ ভারতে ফিরে এলে নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রসারণে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পেতে থাকেন। স্থাপিত হতে শুরু হলো নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তনের আদর্শগত ভিত্তি।

নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রচলনের জন্য উপরিকাঠামোতে পরিবর্তন শুরু হয় 1958 থেকে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার প্রথম ডীন হলেন র‍্যালফ কিউমিংস, রকফেলার ফাউণ্ডেশনের ফিল্ড ডাইরেক্টর।

1966 সালে, খরার বছরে ভারত যখন গমের জন্য আমেরিকার কাছে হাত পাতলো তখন ভারতের কৃষিকে অচল অনড় নিগড় থেকে উদ্ধার করার প্রয়াসে উচ্চফলনশীল বীজ প্রযুক্তি ঢালাও চালু করার শর্ত আরোপ করলো আমেরিকা সরকার, আমেরিকার কৃষি সচিবের সঙ্গে ভারতের কৃষি মন্ত্রীকে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে সবুজ বিপ্লব বিষয়ে।[2]

উচ্চফলনশীল প্রযুক্তি চালু হওয়ার সময়ে ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। কোনও সন্দেহ নেই শুরুর দিকে উৎপাদনের তাৎক্ষণিক পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, কৃষিপণ্যের আমদানী কমিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে

দেখা গেল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের আড়ালে কৃষিতে প্রযুক্তিগত পরনির্ভরশীলতা বেড়ে যেতে লাগল।

ভারতের মতন গরীব দেশে এই-রূপ খরচবহুল এবং আমদানী নির্ভর কৃষি প্রযুক্তি প্রচলনের জন্য প্রয়োজন হলো বিপুল আর্থিক সাহায্য। এবার এগিয়ে এলো বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠলো বিভিন্ন জাতীয় বীজ প্রকল্প (ন্যাশনাল সীড প্রোজেক্ট) 1969তে তরাই সীড কর্পোরেশন, 1976তে এন এস পি-1, 1978তে এন এস পি-2 1988তে এন এস পি-3। এই তৃতীয় প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বেসরকারী ও বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে বীজ উৎপাদনে যুক্ত করা। (মোট বিদেশী ঋণ আনুমানিক 2 কোটি 4 লক্ষ ডলার)।

এত করেও দেখা গেল বীজের বাজারের বিস্তার সন্তোষজনক নয়। কারণ খুঁজতে গিয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প রিপোর্ট (এন এস পি-3) তে জানালো, "স্বপরাগ সংযোজিত শস্যের বিশেষতঃ ধান ও গমের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ বীজ চাষীরা নিজে ব্যবহার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে বিনিময়/হস্তান্তর করে।"[3]

এদিকে গত তিন দশকে চাষী উচ্চফলনশীল বীজে অভ্যস্থ হয়েছে বটে, কিন্তু সেই অর্থে বীজের বাজারের বিস্তার ঘটেনি। বিস্তার ঘটেছে সার, কীটনাশক, জলের ব্যবহার এবং কৃষি যন্ত্রপাতির। এরই মধ্যে সার্বিক দেশজ প্রযুক্তি, বীজ কৃষকের নাগালের বাইরে চলে গেছে, রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহারে জমি উর্বরতা হারিয়েছে, ফসলে কীটনাশকের আক্রমণ বেড়ে চলেছে, অতিরিক্ত জলের ব্যবহারে মাটির নীচে জলস্তর ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে। চাষের খরচ বেড়ে যাচ্ছে, সে দায় মেটাতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে, দেশের ঘাড়ে বিদেশী ঋণের বোঝা বাড়ছে। আর এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার যুক্তিতে।

এই শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় কৃষকরা প্রায় 50,000 বিভিন্ন প্রজাতি, উপ-প্রজাতির ধানবীজ চাষ করতো। উচ্চফলনশীল বীজ প্রযুক্তির একমুখী পথ ধরে চলার ফলে আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু বীজ বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর আজ বর্ধিত ফসল উৎপাদনের (বাম্পার ক্রপ) দশকে উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা পূরণের জন্য আমরা হাত পেতে আছি নিত্য নতুন বীজের জন্য। এরই ফাঁকে বীজের বাজার দখল করার জন্য বহুজাতিক কোম্পানীগুলি নিয়ে এসেছে সংকর জাতীয় উচ্চফলনশীল (হাইব্রীড) বীজ। শুরু হয়ে গেছে সংকর জাতীয় বীজ ব্যবহার। আর এর ফলে এভাবে চললে এ দেশে 2000 সাল নাগাদ মাত্র 50টি জাতের ধান-বীজ চাষ প্রচলিত থাকবে।[4]

সংকর জাতীয় বীজের মূল বৈশিষ্ট্য হল এগুলি পরিবর্ধন করলে এর উচ্চ ফলনশীল বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় এবং সংকর বীজের চরিত্রের বদলে মূল বীজের বৈশিষ্ট্যের কোনও একটিতে ফিরে যায়। এই সংকর বীজের অংকুরোদ্গমের মান, প্রাকৃতিক ঋতুবৈচিত্র নিরপেক্ষ হওয়ায়, সহজেই চাষীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এরই মধ্য দিয়ে বহু-জাতিক সংস্থাগুলির বীজের বাজার তৈরীর ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে।

এই সংকর জাতীয় বীজ হলো জীব-প্রযুক্তির (বায়োটেকনোলজি) আধুনিক অবদান। বায়োটেকনোলজির জন্ম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারী গবেষণা সংস্থাগুলির গবেষণাগারে। আর এই প্রযুক্তির উপর প্রথম থেকেই দখল কায়েম করেছে বিভিন্ন কৃষি-রাসায়নিক এবং ভেষজ বহুজাতিক সংস্থাগুলি। এদের আর্থিক আনুকুল্যেই এই প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে। বহুজাতিক সংস্থা মনস্যান্টো ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছে 23·5 লক্ষ মার্কিন ডলার, হেক্সট ম্যাসাচুসেট জেনারেল হাসপাতালে দিয়েছে ক্রপ জেনেটিকস-এর গবেষণার জন্য 70 লক্ষ মার্কিন ডলার।[5] উদ্দেশ্য একটাই, গবেষণার সুফল এইসব বহুজাতিক সংস্থাগুলির ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করা। লক্ষ্যণীয় যে বহুজাতিক সংস্থাগুলি কীটনাশক এবং ভেষজ

শিল্পে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং বীজের বাজারে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে, সেই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাত ধরেই বায়োটেকনোলজির গবেষণা এগিয়ে চলছে এবং দিক-নির্দেশিত হচ্ছে।

এইসব বহুজাতিক সংস্থাগুলি বীজের বাজারের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য উন্নতমানের প্রজাতি সৃষ্টির অধিকার প্ল্যান্ট ব্রীডিং রাইট (পিবিআর) ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছে।

1966 সাল থেকে ফিলিপাইনের ম্যানিলার ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভারতে উচ্চফলনশীল ধান বীজ যোগান দিতে শুরু করে। কয়েক বছরের মধ্যেই আই. আর. আর. আই. ভারতের মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে 16000 এরও বেশী বিভিন্ন প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির ধানের জার্ম প্লাসম সংগ্রহ করে নিল উচ্চ-গবেষণার জন্য।

পিবিআর অনুযায়ী, উদ্ভিদ সংযোজনের অধিকার বলে উন্নতমানের প্রজাতি সৃষ্টির অধিকারী নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ পুনরুৎপাদন করার, বাজারজাত করার এবং বিক্রীর অধিকার অর্জন করে। এক্ষেত্রে, 'পদ্ধতি প্রকরণ সংরক্ষণ অধিকার' (প্রসেস পেটেন্ট) বলে একটি বিশেষ প্রয়োগ পদ্ধতিতে উৎপাদনের অধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়। যেমন, কোনও ক্ষুদ্র জীবানুর দেহে একটি নতুন জিনের প্রবেশ করানোর পদ্ধতি।[6]

বহুজাতিক সংস্থাগুলি এই পদ্ধতি প্রকরণ সংরক্ষণ অধিকারের (প্রসেস পেটেন্ট) বদলে 'সৃষ্টবস্তু সংরক্ষণ অধিকার' ব্যবস্থা (প্রোডাক্ট পেটেন্ট) প্রবর্তন করতে চাইছে। একজন সৃষ্ট বস্তু সংরক্ষণ অধিকারী সর্বগ্রাসী ক্ষমতার অধিকার অর্জন করবে। এর বলে, যে সমস্ত প্রজাতির মধ্যে তার জিন প্রবেশ করানো হয়েছে বা থাকছে সে সবগুলির ক্ষেত্রে সে কর্তৃত্ব করবার অধিকারী হবে। বস্তুত এর বলে অন্যকে এই জিন ব্যবহার করতে, এমন কি অন্যের নিজস্ব প্রজাতিতেও প্রবেশ করাতে, বাধা দিতে পারবে।

'সবুজ বিপ্লব' প্রযুক্তির সঙ্গে 'জীব প্রযুক্তি'র একটি অন্যতম পার্থক্য এই যে, 'সবুজ বিপ্লব' প্রযুক্তি সম্পূর্ণভাবেই আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংস্থার (আই.সি.এ.আর.) নিয়ন্ত্রিত করে আর 'জীবপ্রযুক্তি' নিয়ন্ত্রণ করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইউরোপ ও আমেরিকায় জিন ব্যাংকগুলিতে যে সব জিন সংরক্ষিত আছে এবং যেগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে নতুন নতুন বীজের উদ্ভব হয়েছে সেগুলির প্রায় সমস্ত জিনেরই জন্মস্থান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, যেমন—

খাদ্যশস্য	জন্মস্থান
বার্লি	এশিয়া মাইনর, ইথিওপিয়া
ভুট্টা	মধ্য আমেরিকা, আন্দিজ
ধান	ভারত, বর্মা, দঃ পূঃ এশিয়া, পঃ আফ্রিকা
গম	ইথিওপিয়া, এশিয়া মাইনর
আখ	ভারত, বর্মা, দঃ পূঃ এশিয়া, চীন

প্রধান 30টি খাদ্যশস্য যা মানবজাতির 95% পুষ্টিমূল্য যোগায়, তাদের উদ্ভব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে।

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার শস্যসমৃদ্ধ দেশগুলি বাস্তবিকই তৃতীয় বিশ্বের জিনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্য উত্তরের 'শস্যসমৃদ্ধ' দেশগুলি দক্ষিণের দারিদ্রের সুযোগে বাধাহীনভাবে এইসব দেশ থেকে জিন সংগ্রহ করেছে এবং উন্নতমানের বীজ উৎপানের উপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছে।

□ **অরূপ রতন মুখোপাধ্যায়**

সূত্র নির্দেশ :

1. দ্যা ভায়োলেন্স অফ দ্যা গ্রীণ রেভোলিউশন—বন্দনা শিবা-থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক / 2. গ্রীণ রেভোলিউশন ইন ইন্ডিয়া—জগন্নাথ পাথি-পেপার প্রেজেন্টেড অ্যাট এ সেমিনার অন "দ্যা ক্রাইসিস ইন এগ্রিকালচার" অ্যাপেন/টি ডব্লিউ এন, পেনাঙ, জানুয়ারী, 1990. / 3. প্রজেক্ট ডকুমেন্ট-নোট অফ ন্যাশনাল সিড প্রজেক্ট III. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক / 4. দ্যা স্টেট অফ ইন্ডিয়াজ এনভায়রণমেন্ট (1984-85) দ্যা সেকেন্ড সিটিজেনস রিপোর্ট—(পৃঃ 299) সেন্টার ফর সাইন্স এ্যান্ড এনভায়রণমেন্ট / 5. নিউ হোপ অর ফলস, প্রমিস? বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড এগ্রিকালচার—আই সি ডি এ, চ্যাপ্টার 3, পেজ 13 / 6. একই চ্যাপ্টার 7 / 7. সিড অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি—সহাবত আলম—মালয়েশিয়া।

চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন
একটি রিপোর্ট

দুনিয়ার নানান কোণ থেকে আজ এই প্রশ্নগুলো বারে বারেই উঠছে :

পৃথিবীর জল, মাটি, বাতাস আর প্রকৃতির নানা সম্পদের উপরে অধিকার কার? হাজার বছর ধরে লড়াই করে বেঁচে থাকা অসংখ্য সাধারণ মানুষের, নাকি ক্ষমতার বলে বলীয়ান অল্প কিছু ব্যবসায়ী-আমলা ও নেতাদের?

কোনটা বেশী জরুরী? বেশ কয়েক হাজার মানুষের পেট পুরে দুমুঠো খেতে পাওয়া? নাকি 'ঋণের দায়ে চুল বিকানো' দেশের মানুষকে 'বিদেশী মুদ্রা রোজগারের' টোপ দেখিয়ে অল্প কয়েকজনের ফুলে-ফেঁপে ওঠা?

কোন মনোভাব নিয়ে আমরা চারপাশের এই জ্যান্ত প্রকৃতিকে ছোঁবো? 'জিতে নেব, ছিনিয়ে নেব' এই মনোভাব? নাকি 'টি'কে থাকো—আর টি'কিয়ে রাখো' এই মনোভাব? কেন না এরই উপরে নির্ভর করছে, কোন উন্নয়ন আর কোন প্রযুক্তিকে আমরা বেছে নেব।

পুরানো, লোক পরম্পরা ধরে ব্যবহার করা প্রযুক্তি খরচ করে কম, উৎপাদনও হয় অল্প, মানুষের দরকারমাফিক—অথচ তা টি'কিয়ে রাখে গাছ-গাছালি, পশুপাখি, জলজ হাজারো জীবনের অস্তিত্ব।

আর আধুনিক তথাকথিত 'উন্নত' প্রযুক্তি কম সময়ে দেয় 'বেশী' ফলন, কিন্তু একদিকে প্রকৃতির সম্পদ খরচ হয় প্রচুর, অন্য দিকে তা বিপদে ফেলে আশেপাশের মানুষ আর নানান প্রাণকে।

কোনটা বেছে নেব আমরা?

যে কোন 'উন্নয়নকে' ঘিরেই আজ এই প্রশ্নগুলো উঠছে। উঠেছে চিপকো, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনেও, আর এই ধারায় সবচেয়ে নবীন কণ্ঠ 'চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন'-এর।

এই আন্দোলনের কর্মীরা সারা ভারত জুড়ে একই মনোভাবের মানুষ আর সহানুভূতিশীল সংগঠনগুলোর একটা সম্মেলন ডেকেছিলেন '93-এর সেপ্টেম্বর মাসে।

আমরা দুই ঘরকুনো বাঙালিনী খানিকটা "একলা একলা (!) বেড়াবার মজায়, খানিকটা উড়িষ্যার বন্ধুদের ডাকে, আর খানিকটা জানার ইচ্ছে নিয়ে গিয়ে পড়েছিলাম পুরীর এই সম্মেলনে। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বাসে আর নৌকোয় করে চিলিকার বিভিন্ন এলাকায় ঘোরা, মানুষদের সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ ঘটে গেল। যা দেখেছি, যা ভেবেছি, ইচ্ছে হল তা আমাদের বন্ধুরাও জানুক। তাই এই প্রতিবেদন।

চিলিকা—ভারতের বৃহত্তম আধা নোনা জলের 'লেগুন'

পুরীর কাছেই সুন্দর একটা বেড়াতে যাবার জায়গা হিসেবে বাঙালীদের কাছে চিলিকা বেশ পুরনো নাম। অনেকেই জানেন এর অফুরান মাছের ভাঁড়ার আর যাযাবর

পাখিদের আনাগোনার কথা।

সমুদ্রের কাছে উড়িষ্যার পুরী ও গঞ্জাম এই দুই জেলা জুড়ে রয়েছে চিলিকা। আসলে এটা 916 বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটা খুব বড় আধানোনা জলের অগভীর জলাভূমি। উত্তর-পূব আর উত্তর-পশ্চিম থেকে অন্ততঃ চল্লিশটা নদী-নালা মিঠে জল এনে ঢালছে চিলিকায়। দক্ষিণে 'মগরমুখা' বলে একটা খাঁড়ি দিয়ে এই জল আর নদীর পলি চলে যাচ্ছে সাগরে, আর সাগরের নোনাজল ফিরেও আসছে জোয়ারের সাথে সাথে। বর্ষার পরে বছরে ছমাস চিলিকার জল থাকে মিঠে, গাছ-গাছালি গজায়, আর ছমাস দখিনা হাওয়ায় জোয়ারের জল ঢুকে তা হয় নোনা—অদরকারী আগাছা মরে যায়। টানা পোড়েনের বিচিত্র খেয়ালে প্রকৃতি এখানে বাঁচিয়ে রেখেছে অন্ততঃ 160টি প্রজাতির মাছ ও জলের জীব গাছপালা, 158টি প্রজাতির পাখি, এমনকি মানুষকেও। 1973 এ গোটা চিলিকা এলাকাটাই অভয়ারণ্য বলে ঘোষিত হয়।

যোদ্ধার জাত

এবারে বলি চিলিকার 632টি গ্রামের (যার মধ্যে 191টা গ্রাম শুধু-মাত্র মৎস্যজীবিদের) বাসিন্দাদের কথা। এঁরা নাকি উড়িষ্যার প্রাচীন যোদ্ধাদের বংশধর। এই প্রায় দুলাখ লোকের মধ্যে আছেন দলিতরা যাঁরা জাতিতে জেলে। উচ্চবর্ণের লোকেরাও আছেন যাঁরা জাতে না হলেও পেশায় জেলে এবং খুব অল্প কিছু অন্য কাজ করেন।

চিলিকার অধিবাসীরা এখানে মাছ চাষ করেন, ধান চাষও করেন। বর্ষার জল নেমে গেলে জেগে ওঠে ডাঙা। সেখানে গজায় অজস্র ঘাস, চরে বেড়ায় তাঁদের গোরু, মোষ। তাদের মলমূত্র আর রয়ে যাওয়া ঘাস-ই হয় মাছের খাবার। বিনে পয়সায় পাওয়া সূর্যালোক, আর অক্সিজেন এই দিয়েই খুব সাধারণ পুরনো পদ্ধতিতে তাঁরা পুরুষের পর পুরুষ ধরে মাছ চাষ করছেন, পরিবেশকে বাঁচিয়েও রাখছেন।

এশিয়ার প্রথম কো-অপারেটিভ

এঁদের একসাথে চলার ইতিহাসটাও কয়েকশো বছরের পুরানো। আফগান আমল থেকে এই মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার অধিকার পেয়ে আসছেন চিলিকায়। ব্রিটিশরাও এঁদের এই অধিকার মেনে নেন। সেই সময় এখানে 25টি মৎস্যজীবীদের কো-অপারেটিভ গড়ে ওঠে। সবচেয়ে প্রথমটি বালুগাঁওয়ে—1926 সালে।

স্বাধীনতার পর 1959 সালে উড়িষ্যা সরকার মৎস্যজীবীদের অধিকারকে স্বীকৃতি জানাতে একটা কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ তৈরী করে বালুগাঁওতে আর তাকে লীজ দেয় গোটা চিলিকায় মাছ ধরার অধিকার। এর অধীনে সাবলীজ নিয়ে কাজ করত 65টি গ্রামীণ মৎস্যজীবিদের কো-অপারেটিভ সত্তরের দশক পর্যন্ত। এখানে পুরানো গ্রামীণ সমাজ ছিল খুব সংঘবদ্ধ, আর গ্রাম সমিতিগুলোও ছিল বেশ সক্রিয়। বিভিন্ন পরিবার গুলোর মধ্যে গ্রামের বরাদ্দ মাছ ধরার এলাকা বিলি ব্যবস্থা করা, ঝগড়া কাজিয়া মেটানো—এসব তারা করে এসেছে দক্ষতার সাথে।

সোনার খনি

শতাব্দীর পুরানো প্রযুক্তি আর পুরানো সহযোগিতা নিয়ে চিলিকায় সন্তানরা বেঁচে-বর্তে ছিল বেশ। কিন্তু অবস্থাটা বদলালো 77-78 সাল থেকে। একদল ব্যবসায়ীর নজরে পড়ল যে চিলিকায় অগভীর আধা-নোনা জলে চিংড়ির চাষ হয়ে উঠতে পারে সোনার খনি। চাষ করতে হলে চিংড়ির বীজ কিনতে হয় পারাদ্বীপ থেকে, বিশেষ রকমের গেঁড়ি চাই খাবার হিসেবে, বিশেষ ধরনের জাল চাই—এসবের খরচ গরীব মাছচাষীরা জোগাবে কোথা থেকে? সরকারের ভুল নীতির সুযোগে, মহাজনী কারবার আর দাদনের পয়সা নিয়ে এখানে ঢুকতে লাগল এলাকায় বাইরের দালাল, ব্যবসায়ী আর তাদের অভয় দেবার জন্যে রাজনৈতিক দাদারা ও তাদের

গণ্ডাবাহিনী। আস্তে আস্তে অনেকটা মাছ চাষের জমিই বেহাত হয়ে গেলো স্থানীয় মৎস্যজীবিদের হাত থেকে। এই মাছ-মাফিয়ারা জাঁকিয়ে বসলো সমস্ত মাছ ব্যবসা আর খেটে খাওয়া মানুষের কাঁধে। যেখানে কোনদিন এত মদের দোকানও ছিল না অতীতে; আজ সেখানে চলছে গ্রামে গ্রামে ঝগড়া-কোঁদল, কেস-কাছারি, মারপিট, বোমা-বাজি আর মাছির মত ভ্যান ভ্যান করছে উকিল, ঘুষখোর, সরকারী আমলা, পুলিশ, কোর্টের কর্মীরা।

রাঘব বোয়াল—টাটা অ্যাকোয়াটিক ফার্মস্ লিমিটেড

অবস্থা চরমে উঠল যখন সোনার খনিকে 'হীরের খনি' বানানোর প্রস্তাব নিয়ে আসরে নামল টাটারা 1976 সালে। সরকারকে ভাগীদার করে টাটা অ্যাকোয়াটিক ফার্ম'স্ লিমিটেড নামে কোম্পানী তৈরী হল। পরে নাম বদলে তা হল চিলিকা অ্যাকোয়োটিক ফার্ম'স্ লিমিটেড বা সি এ এফ এল (এই প্রোজেক্টে মোট খরচ কুড়ি কোটি টাকা)। প্রস্তাব হল এই প্রোজেক্টকে ভুবানিয়া খালের উপরে সবচেয়ে ভাল চিংড়ি চাষের 1400 একর জমি 15 বছরের জন্য লীজ দেওয়া হবে। গোটা এলাকা ঘিরে 13·7 কিমি লম্বা, 40 ফুট চওড়া আর 30 ফুট উঁচু একটা গোল আকারের কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হবে। ছোট ছোট পুকুরে তাকে ভাগ করে নিয়ে হবে চিংড়ি তৈরীর ফার্ম'। ফার্মের পুকুরগুলোতে 'আধুনিক উন্নত' প্রথায় বেশী প্রোটিনযুক্ত খাবার, কীটনাশক, ওষুধ এসব দিয়ে পোনা থেকে রাক্ষুসে সাইজের চিংড়ি তৈরী হবে। মাত্র দেড় মাসেই তাদের ওজন হবে 300 গ্রাম (পুরনো পদ্ধতিতে তিন মাসে হত 50-60 গ্রাম। প্রত্যেক দিন চিলিকার নোনা জল পুকুরগুলোতে পাম্প করা হবে 150টা পাম্প চালিয়ে। চলবে চারটে জেনারেটর আর 720টা এরিয়েটর। পুকুরগুলোর নোংরা জল ফেলা হবে ভুবানিয়ায়।

চিংড়িদের 'বিদেশ যাত্রা'র জন্য প্রসেসিং করা হবে পুরী-ভুবনেশ্বর সড়কের উপরে একটা প্ল্যাণ্টে। এছাড়া পুরীতে বসবে চিংড়ি বীজ থেকে পোনা তৈরীর হ্যাচারি, আর চিংড়ির খাবার তৈরীর মিল।

এই চিংড়ি আমেরিকা আর জাপানে বিক্রি করে বিদেশী মুদ্রা রোজগার হবে —গরীব দেশের ধারের বোঝা হালকা হবে। হ্যাঁ, দেশের স্বার্থে অবশ্যই তারা চিংড়ির খাবার আর পোনা অন্য চাষীদেরও সরবরাহ করবে। এছাড়া আরো নানা উন্নয়নের হাওয়া নাকি বয়ে যাবে চিলিকায়।

ওয়াপ্‌কো (ডব্লিউ এ পি সি ও) বলে একটা সংস্থাকে দিয়ে পরিবেশের উপর এই ফার্মের প্রভাব সম্বন্ধে সার্ভে করানো হল। বলা বাহুল্য যে তাদের রিপোর্ট গেল টাটাদের পক্ষেই।

উড়িষ্যা ম্যারিটাইম অ্যান্ড চিলিকা এরিয়া ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন বা ও এম সি এ ডি-এর মাধ্যমে আরো খানিকটা বাড়তি জমি দিয়ে মোট 600 হেক্টরও সি এ এফ এল-কে লীজ দেবার কথা পাকা হয়ে যায় কংগ্রেস আমলেই।

ভোট ফুরোলে চিনতে নারি

নানান ছোট ছোট লড়াইয়ে হয়রান চিলিকার মানুষরা সভায় দেখছিলেন যে বিদেশী মুদ্রা লাভের এই 'বৈজ্ঞানিক' প্রোজেক্ট আসলে বৈজ্ঞানিকভাবে মস্ত থাবা বাড়াচ্ছে তাঁদের রুজি রোজগার আর চিলিকার ভবিষ্যতের উপরে। সরকার তো রক্ষক নয়, ভক্ষক। শোনা যায় 'টাটাকে কিছুতেই এখানে ঢুকতে দেব না'—চিলিকার জল ছুঁয়ে এই প্রতিজ্ঞার পরে বিজু পট্টনায়ক তথা জনতা দল এখানে নির্বাচনে জেতেন। এত কিছুর পরেও গদীয়ান হয়েই বিজু গাঁটছড়া বাঁধেন টাটাদের সাথে। বালুগাঁও-এ মৎস্যজীবীদের কেন্দ্রীয় কো-অপারেটিভ ভেঙে ফেলে তিনি মিশিয়ে দেন উড়িষ্যার প্রাদেশিক মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ ফেডারেশনের সাথে, যাতে চিলিকায় মাছ ধরার একচেটিয়া অধিকার তাদের না থাকে। সিদ্ধান্ত হয়ে যায় 1991-তে স্থানীয় কো-অপারেটিভ গুলোর লীজের মেয়াদ ফুরোলে তা আর নতুন করে বাড়ানো হবে না—বরং এবার থেকে বাজারে নীলাম করে

দেওয়া হবে। 'মৎস্যজীবি মহাসংঘের' নানা প্রতিবাদে কোন ফলই হচ্ছিল না। হতাশ হয়ে তাঁরা ভাবছিলেন যে এত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে ঠেকানো তাঁদের মত চুনোপুঁটির কর্ম নয়।

ক্রান্তিদর্শী যুবসংঘম, চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন

চলতি রাজনীতির মিথ্যাচার, দলবাজি, মানুষের নীতিহীনতা, সামাজিক নানা অন্যায়ের প্রতিবাদে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন 'মিট দ্য স্টুডেন্টস্' অনেকদিন ধরেই কাজ করছিলেন। পথের দিশা খুঁজতে তাঁরা উড়িষ্যার নামকরা বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মীদের একটা সম্মেলন ডাকেন। ঠিক হয় মানুষের মধ্যে বিশ্বাস আর হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে গেলে একেবারে মাটির কাছের মানুষের খুব কাছে যেতে হবে। চিলিকা এলাকায় গ্রামে গিয়ে এই সংগঠনের ছেলেমেয়েরা দিনের পর দিন গ্রামের লোকেদের সাথে থাকেন, কথা বলেন, গোটা এলাকায় ঘুরে এখানকার পরিবেশ ও ও মানুষ, তাদের পরম্পরাভিত্তিক জ্ঞান, সহযোগিতাকে বোঝার চেষ্টা করেন। ভেঙে পড়া মানুষের বুকে যোগায় বল। নিজেদের মধ্যে লড়াই মুলতুবি রেখে সবাই একসাথে সরকার-পুঁজিপতি আমলা-মাফিয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

টাটাদের প্রোজেক্টের বিরুদ্ধে 1991-এর 20 সেপ্টেম্বর 'মৎস্যজীবি মহাসংঘ' ও 'মিট দ্যা স্টুডেন্টস্'-এর যৌথ উদ্যোগে চিলিকা থেকে ভুবনেশ্বরে যায় প্রায় আট হাজার লোকের একটা মিছিল বিধানসভায় একটা প্রতিবাদপত্র দাখিল করতে। কোন রাজনৈতিক দলের ছাতা ছাড়াই এই মিছিলে স্বেচ্ছায় আসেন গ্রামের বৌ-ঝি-ছেলে-বুড়ো সবাই। বাধ্য হয়ে সরকার সর্বকিছু খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটা কমিটি গঠন করেন, কিন্তু ঐ কমিটির মিটিং হল না একটাও।

এসবের তোয়াক্কা না করেই 1991-এর ডিসেম্বরে বে-আইনীভাবে আগাম জমি দখলের অনুমতি পায় টাটারা। বাঁধ গড়া শুরু হয়। সাথে সাথে চলতে থাকে মানুষের উপর হামলা আর ভয় দেখানো।

এই ছেলেমেয়েরাই পরে তৈরী করেন ক্রান্তিদর্শী যুবসংঘম। এগিয়ে এলেন উড়িষ্যার সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবীরাও। এই আন্দোলনের সমর্থনে তাঁরা গঠন করেন 'চিলিকা সুরক্ষা পরিষদ'। উড়িষ্যার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতিগুলিও এর পাশে দাঁড়ায়।

1992-র 15 জানুয়ারী গোপীনাথপুর গ্রামের সম্মেলনে মৎস্যজীবি, কৃষক মহাসংঘ, ছাত্র, যুব সমাজকর্মী সবাইকে একজোট করে শুরু হল 'চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন'। মৎস্যজীবীদের মধ্য থেকে 55 জন প্রতিনিধি নিয়ে এক্সেকিউটিভ কমিটি গঠিত হল।

টাটার প্রোজেক্টের বিরুদ্ধে চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন কি বলেছে?

1. এতকাল মাছ ধরা জাল দিয়ে এলাকা ভাগ করা থাকত। তাতে জলের প্রবাহ আটকাতো না। এত বড় একটা পাকা বাঁধ আটকাবে দয়া, ভার্গবী, লুনা, কানিয়া নদীর বয়ে আনা বন্যার জলকে। সাগরে যেতে না পেরে তা ডুবিয়ে দেবে কাছের তো বটেই, এমনকি অনেক দূরের গ্রামের জমি-জমা। প্রায় 35,000 একর ধানখেত এতে জলে ডুবে যাবে।

2. এমনিতেই ছোট ছোট মাটির বাঁধ দেওয়া, বন হাসিল করা এসব কারণে নদীতে পলি জমছে। পলি জমে চিলিকা মরে আসছে।

উল্টো দিকে 'মগরমুখা'র গভীরতাও পলি জমে অনেক কমে এসেছে। বাঁধ দেবার ফলে জোয়ারের নোনা জল আগের চেয়ে ঢুকবে আরো কম। মাছেরা আগের মতন সমুদ্রে ডিম ছাড়তে যাওয়া, আর পরে ফিরে আসার পথে বাধা পাবে। নোনা জলের পরিমাণ কম হলে চিলিকায় অদরকারী আগাছা বাড়বে, মাছেরা অক্সিজেন কম পাবে, বাড়বে মশা আর ফাইলেরিয়া।

3. অল্প সময়ে 'রাক্ষুসে'

সাইজের চিংড়ি তৈরী করতে গেলে জলে দেওয়া হবে নানা রকম প্রোটীন, কীটনাশক, ওষুধ। ব্যবহার করা দূষিত জল ভুবানিয়া বেয়ে সমস্ত চিলিকার জলকে বিষাক্ত করবে। আশেপাশের মাছ চাষীরা মার খাবে।

4. টাটাকে দিয়ে দেওয়া জমি ছিল সর্বসাধারণের। এখন থেকে কোথায় চরবে তাঁদের 80,000 গোরু মোষ? ডোবা জমিতে ঘাস না গজালে খাবে কি তারা? এই এলাকার লোকেদের একটা বড় আয় হয় দুধ থেকে, সেটাও মার খাবে।

5. এত বড় একটা ধনী প্রতিষ্ঠান যদি উৎপাদনের কাজে নামে তবে দেখাদেখি আসবে আরো অনেকে। তারাই ঠিক করবে মাছের দাম। প্রতিযোগিতায় টিঁকতে না পেরে উৎখাত হবে পুরনো মাছ চাষীরা।

6. বাঁধ দেওয়া জায়গায় এত কাল তাঁরা নৌকো বাঁধতো, এখন থেকে তা আর হবে না। তাছাড়া নিজেদের চাষের এলাকায় এবার থেকে যেতে হবে ঘুর পথে।

7. এতগুলো জেনারেটর, পাম্প এসবের আওয়াজে বিরক্ত হবে পাখিরা। খাবার না পেয়ে অন্য কোথাও সরে যাবে তারা। কাছেই নলবন দ্বীপ—পাখিদের অভয়ারণ্য আর টুরিস্টদের স্বর্গ। এখন থেকে টুরিস্টদের আকর্ষণও কমে যাবে।

8. প্রত্যেকদিন পুড়বে প্রায় 7000 লিটার ডিজেল। অযথা শক্তি খরচ করা ছাড়াও পরিবেশকে তা দূষিত করবেই।

9. এত বড় একটা প্রোজেক্ট, যা কেড়ে নেবে সরাসরি 26টি গ্রামের 41,000 মানুষের মুখের ভাত, আর ক্ষতি করবে গোটা চিলিকা ও তার মানুষদের, বিনিময়ে তা কি দেবে? —ফার্মে চাকরি পাবে শিক্ষিত, কাজ জানা জনা চল্লিশেক লোক। 'অশিক্ষিত' জেলেদের জন্য খুব জোর জুটতে পারে শ'তিনেক ঠিকা শ্রমিকের কাজ, তবে এই 'উন্নয়ন' কার জন্যে? এত বছর ধরে যে জমি সাধারণের ব্যবহারের জন্য 'রাখিতা' ছিল, তা এইভাবে বাইরের ব্যবসায়ীদের বন্দোবস্ত করে দেবার অধিকার সরকারকে দিল কে?

আন্দোলন, আন্দোলন

1992-এর 16 ফেব্রুয়ারী প্রায় 5000 জন মৎস্যজীবী মহিলা, ধানচাষী, সমাজকর্মী, ছাত্রছাত্রী মিলে টাটার অধিকৃত এলাকা দখল করে নিজেদের পতাকা তোলে। তারা এই অঞ্চলে জনতার কারফিউ ঘোষণা করে।

1992 এর 7 মার্চ 1000 জন গ্রামের মহিলাদের মিছিল যায় বাঁধ ভাঙতে। 15 মার্চে প্রায় 6000 জনের এক জনতা পুলিস ও গুন্ডাদের মারধোর অগ্রাহ্য করে বাঁধের একপাশ ভেঙে দেয়। 25 মার্চ একটা 'চেকগেট' তৈরী করে যাতে টাটার গাড়ীগুলো চিলিকা এলাকায় ঢুকতে না পারে। পরে অবশ্য তা তুলে নেওয়া হয়।

28 মার্চ আরো একটা মিছিল যাবে টাটার এলাকা দখল করতে—এ খবর পেয়ে হাজির হয় 11 প্লেটুন পুলিশ বাহিনী। লাঠি চার্জ—আর গ্রেপ্তার হয় 69 জনের—এদের মধ্যে ছিলেন 33 জন মহিলা আর 6টা বাচ্চাও। এর পরে পরেই গ্রেপ্তার হন নেতারাও। প্রতিবাদে ছাত্ররা ঘেরাও করে রাখে পুরীর জেলা কালেক্টরকে। 9 এপ্রিল সকলে মুক্তি পান।

জনমত গড়ে ওঠে। টাটার প্রজেক্ট তুলে নেবার জন্য অনুরোধ করে 21 জন এম পির সই করা একটা চিঠি পাঠায় 'আন্দোলন', প্রধানমন্ত্রী ও পরিবেশ দপ্তরে। জুন মাসে পরিবেশ ও বনদপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উড়িষ্যার সরকারকে নির্দেশ দেয় সমস্ত পরিবেশ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সি এ এফ এল-কে ছাড়পত্র না দিতে।

1992-এর সেপ্টেম্বরে গোটা চিলিকায় 15 দিন ব্যাপী পদযাত্রা হয়। এই এলাকার চারটি ব্লকের 632টি গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা সম্মেলন হয়। একটা বিকল্প প্রস্তাব নেওয়া হয়, মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য। ঠিক হয়, দরকার হলে টাটারা এখান থেকে চিংড়ি কিনতে পারে, কিন্তু চাষ করবে

পুরনো চাষীরাই।

আন্দোলন এভাবে চলতেই থাকে। উড়িষ্যা ও ভারতের বিভিন্ন কোণায় বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, পরিবেশ সচেতন মানুষের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন। বাধ্য হয়েই পিছু হটে টাটারা, তারা প্রোজেক্ট বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। টাটারা চলে গেল। কিন্তু লড়াই এখনো থামেনি। রয়ে গেছে মাছ-মাফিয়া, গুন্ডামি, ঘুষের খেলা, মানুষের হয়রানি। চিলিকা ও তার সন্তানদের বাঁচাতে এ আন্দোলনকে এখনো অনেক দূর হাঁটতে হবে। পথের দিশা খুঁজতেই এই বারের সম্মেলন।

কী দিল চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন?

'চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন' যে সত্যটা সবার সামনে তুলে ধরেছে তা হল উড়িষ্যার গর্ব এই চিলিকা সম্বন্ধে সরকারের কোন সুষ্ঠু নীতিই নেই। সমস্ত চিলিকার পরিবেশ ও মানুষদের জন্য এক নীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট একটা কমিটি গড়ে। আন্দোলন 'হাইকোর্ট' কমিটির কাছে যে বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছে তা হল মানুষের বাঁচার ও বাঁচাবার চেষ্টার একটা অসামান্য দলিল।

মোটা কথায় তাঁরা বলেছেন: (ক) শুধুমাত্র যে কোন মূল্যে মুনাফা-ভিত্তিক ব্যবসার বদলে চিলিকার মাছ চাষ সম্পূর্ণভাবে তুলে দিতে হবে স্থানীয় মানুষদের সমবায় ব্যবস্থার হাতে। (খ) চিংড়ি সর্বনাশ ডেকে আনছে—তাই চিংড়ি চাষই বন্ধ করে দেওয়া হোক। আর যদি করতেই হয় তবে স্থানীয় মানুষেরা স্বাভাবিক উপায়েই তা করবে। (গ) শুধু জাত নয়, গরীব বেকারদেরও সুযোগ দিতে হবে আয়ের হিসেব অনুযায়ী। (ঘ) বাঁধ দিয়ে জলের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করা চলবে না। (ঙ) চিলিকার জন্য তৈরী করা হোক সামগ্রিক নীতি-আইন, যে নীতি-আইন প্রণয়নের ভিত্তি তৈরী করে দেবে চিলিকার সন্তানরাই।

আমরা যা দেখেছি, যা ভেবেছি

চিলিকা বাঁচাও আন্দোলনের কর্মী-দের সাথে গ্রামে গ্রামে ঘুরে যা দেখেছি তা এবারে ছোট করে বলা যাক।

উড়িষ্যার এই অঞ্চলে গ্রাম সমাজের গঠন এখনো পুরনো দিনের মতই আছে তার ভালমন্দ দুদিক নিয়েই। জগন্নাথ মন্দির ও ভক্তি আন্দোলনের ধারা গভীর ভাবে গাঁথা আছে এখান-কার সব মানুষের চিন্তায়, ব্যবহারে, সংস্কৃতিতে। পুরনো ভারতের জাতি ভেদ, মেয়েদের পেছনে পড়ে থাকা, শিক্ষিত মানুষের প্রতি সমীহ—এসবের পাশাপাশি গ্রামের সংগঠন, সহযোগিতা, পেশা ও পরিবেশ সম্বন্ধে বংশগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, অতিথির সেবা টিঁকে রয়েছে এখনও। উদাহরণ হিসেবে পনস্-পদার মোড়লমশায়ের সঙ্গে কথাবার্তার দু-এক টুকরো বলা যেতে পারে। 'কি ভাবে জমি ভাগ করেন আপনারা?' —'এতকাল তো আমরাই এলাকা ভাগ করে দিয়েছি গ্রামের পরিবারগুলোর মধ্যে। এ বছর যে পরিবার ছোট জমি (প্লট) পাবে পরের বারে তারা বড় জমি পাবে। তবে কোন পরিবারে যদি মেয়ের বিয়ে বা অন্য কোন বেশী খরচের ব্যাপার থাকে তবে সবাই বিবেচনা করে তাকে বড় জমি দেওয়া হয়। এনিয়ে কোন দিন কোন ঝগড়া ঝাঁটি হয়নি তো!'

দ্বিতীয় প্রশ্নটা করতে সংকোচ হচ্ছিল; একটু আগেই যে গ্রামে ঘুরে সরবৎ খেয়ে এসেছি, একটা মাত্র খোলা কুঁয়ো থেকে তোলা তাদের পানীয় জলের চেহারা দেখলে শিউরে উঠবেন আপনারা, আর সবচেয়ে বড় গ্রাম কপিলেশ্বরপুর থেকেও সরকারী হেলথ সেণ্টার 13 কিমি দূরে। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম, 'টাটারা এলে এলাকার কত উন্নতি হতো—এটা কি আপনারা একবারও ভাবেন নি?'

উত্তর এলো, 'রেখে দাও। কোন বাইরের লোকের দরকার নেই। সরকার আমাদের হাতে ছেড়ে দিক—দেখো স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল আমরা নিজেরাই বানাব নিজেদের পয়সায়। কোন 'দল'কেই আমরা বিশ্বাস করি না।' এই আত্মবিশ্বাস আর দৃপ্ত ভঙ্গী

দেখে অবাক হলাম, অভিভূতও।

আর যাঁদের কথা না বললে আমার মনে হবে নিজেদের কথা অর্ধেকও বলিনি তা হল ক্রান্তিদর্শী যুব সংঘম-এর ছেলেমেয়েদের কথা। কোন রাজনৈতিক দল ও দাদাদের ছায়ার বাইরে, সম্পূর্ণ অহিংসা ও মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী এই ছেলেমেয়েদের দেখলে মনে হয় তরতরে সবুজ লতার কথা। কি অসাধারণ খাটনিতে আর লেগে পড়ে থেকে এরা একটা এত বড় কাজ করেছে অথচ কি নম্র নত ব্যবহার। ইউনিভারসিটি পাশ করা তরুণদের ঝাঁটা দিয়ে অতিথিদের এঁটো সাফ করতে দেখাটা এখনকার দুনিয়ায় একটা বিরল ঘটনা।

ভাবতে লজ্জা করে যে, অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালী এখনও 'উৎকল বাসী'-দের দেখেন কিঞ্চিৎ কৌতুক ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই। অথচ উড়িষ্যার মানুষ বালিয়াপাল, বালকো, কোনারক থেকে পুরী পর্যন্ত সমুদ্রতীরের হোটেল ব্যবসার বিরুদ্ধে আন্দোলন, চিলিকা বাঁচাও আন্দোলনের মত বড় বড় আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তাঁদের একতা দিয়ে।

অনেক রাজনৈতিক চেতনার শক্ত ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এত বড় মাপের পরিবেশ আন্দোলন হয়নি। কোথাও শিক্ষিত দক্ষ মানুষেরা এত বড় করে জমায়েত হননি সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য। আজকে তাই আমাদের গণবিজ্ঞানের কর্মীদের নিজেদের বাঁচার খাতিরে একথা বুঝতেই হবে, 'নেতৃত্ব নয়, বন্ধুত্বই শেষ কথা'।

□ অমিতা

এ সম্পর্কে তথ্যের জন্য ঃ

(1) চিলিকা ঃ ভয়েস অফ দ্য পিপল

প্রকাশক—চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন ও ক্রান্তিদর্শী যুব সংঘম।

(এই পুস্তিকার কিছু কপি বি ও বি-র কাছে আছে)

(2) চিলিকা বাঁচাও (সেভ চিলিকা)

প্রকাশক—আপডেট কালেক্টিভ, এইচ-24, গ্রীণ পার্ক এক্সটেনশন—নিউ দিল্লি-110016

(3) চিলিকা লেক কন্ট্রোভার্সি—ডলারস ভার্সেস লাইভলিহুড—ভারত ডোগরা

* চিলিকা বাঁচাও আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ—

বালিসাহি, মঙ্গলা লেন, পুরী, উড়িষ্যা, পিন—752001. [প্রযত্নে—শ্রীমতি দাস]

আর পাঁচটা কল-কারখানার মত চটকলগুলিতেও আজ নেমেছে এক অন্ধকার। ভয়ংকর বিপদের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন অসংখ্য চটকল মজদুর ও তাঁদের পরিবারের মানুষজন। আমাদের আবেদন—নিষ্ক্রিয় থাকবেন না। প্রকৃত তথ্য জানুন। ভিক্টোরিয়া-বরানগর-কানোরিয়া ও অন্যান্য চটকলগুলির আক্রান্ত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান, তাঁদের সাহায্য করুন।

গুণতন্ত্র

অন্য স্বাদে

আমার পরিচিত এক পরিবারে কোনো এক দুপুরে অকস্মাৎ হাজির হয়ে দেখি গৃহকর্তা থেকে শুরু করে কনিষ্ঠতম সদস্যটি পর্যন্ত সকলেই শোকে প্রায় মুহ্যমান। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম বাড়ীর সর্বসুলক্ষণা কন্যারত্নটির জন্য যে পাত্র স্থির হয়েছিল আদপে সে একটি অপাত্র। কিছুক্ষণ আগে বজ্রপাতের মতো খবরটি বয়ে এনেছেন গৃহকর্তার শুভানুধ্যায়ী সহকর্মী। ব্যাপারটি আর একটু খোলসা হতে জানলাম আগে শোনা গিয়েছিল পাত্র ডাক্তার, কিন্তু আসলে সে দাঁতের ডাক্তার। এই হৃদয়বিদারক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের মধ্যে আর দাঁতের ডাক্তার, 'ডাক্তার পদবাচ্য নয় কেন' সে প্রশ্ন তোলবার সাহস জুগোয় নি।

আমাদের মনের ভিতরের এক কিম্ভুত নিক্তিতে আমরা প্রতিনিয়ত চারপাশের মানুষগুলিকে ওজন করে চলেছি যেখানে পরিশ্রম, সততা, ত্যাগ আর দায়িত্ববোধের চেয়ে অনেক বেশী মূল্য 'কৃতিত্ব' তথা 'গুণপনার'। এই মূল্য উপলব্ধি করার নামই বোধহয় 'মূল্যবোধ'! পাল্লার হিসাবে অবধারিত-ভাবেই দাঁতের ডাক্তারের তুলনায় বেশী ওজন চোখের ডাক্তারের; আবার দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে এঁটে ওঠেন না গ্রামীন খালিপদ স্বাস্থ্যকর্মী। কৌলিন্য প্রকাশ করতে অল্প কিছুকাল আগেও নামের পাশে বি এ, এম এ প্রভৃতি লেখা হতো। আজ আমরা সেসব নিয়ে হাসাহাসি করি। অথচ নামের আগে ডক্টর লিখতে আমাদের সংকোচ নেই। নির্বাচন প্রার্থীর যদি ডঃ ডিগ্রী থাকে তবে তার সদ্ব্যবহার করা হয় পুরোমাত্রায়। কেন যে ব্র্যাকেটে ফার্স্ট ক্লাস, গোল্ড মেডালিস্ট ইত্যাদি গুণপনা বাদ যায় জানিনা—লোমহর্ষক ডিগ্রী দেখিয়ে যেখানে নির্বাচকদের সম্ভ্রম আদায়টাই বড় কথা!

আজকাল নাটকে, গানে, কবিতায় চাষীর খুব খাতির। আকাশবাণী দূরদর্শন তো 'চাষী ভাই' ছাড়া কথা কয় না। 'আমরা চাষ করি আনন্দে' গাইতে গিয়ে প্রথিতযশা গায়িকা বিহ্বল হয়ে পড়েন। শ্রমের মূল্য ব্যাপারটিকেও আমরা খুব আকড়ে-পাকড়ে ধরেছি। স্কুলে রচনা লিখতে দেওয়া হচ্ছে শুধু তাই নয়—যে কোনো সভা-সমিতিতেও আকছার ছড়ানো হচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে প্রেমেন মিত্তির থেকে দু এক ছত্র উদ্ধৃতি "আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটে মজুরের।" আমাদের দুর্ভাগ্য, বিদ্বজ্জনদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও পাথর যেখানকার সেখানকারই। আজো জমি চষা বা কারখানায় তেল ঝুল মেখে কাজ করা, সেই বিষয়ে জ্ঞানচর্চার চাইতে যথেষ্টই হেয় কাজ। তা না হলে আর পাত্র খোঁজার বেলায় আমাদের শ্যেনদৃষ্টি কেন গুণপনায় টইটম্বুর কামধেনুগুলির দিকেই? শ্রমের জয়গান গেয়ে ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা লেখার পরও এই সময় আমরা আর নখ-দাঁতগুলি আড়াল করতে পারি না। ভাল পাত্র আর ভাল মানুষ বোধ হয় আলাদা কিছু হবে। একজন অসৎ ডাক্তার দু-মিনিট রুগী দেখে দুশো টাকা ফি নেন, টাকা না থাকলে প্রেসক্রিপসন প্রত্যাহার করে নিতে হাত কাঁপেনা, আর একজন জুটমিলের শ্রমিক সন্ধ্যায় নিজের বস্তিতে সাক্ষরতা প্রসারের কাজ করেন।

—সন্দেহ নেই আমাদের প্রখর মূল্যবোধ সম্পন্ন জহুরীর দৃষ্টিতে প্রথমোক্ত ব্যক্তিই 'ভাল পাত্র' লেবেল নিয়ে জ্বলজ্বল করবেন।

কে যেন বলেছিলেন পার্সোনালিটি বলে আলাদা কিছু নেই পার্সই আসলে পার্সোনালিটি। কথাটি অবশ্যই ধাক্কা দেবার মতো। তবে শুধু পার্স খুব বেশী উঁচুতে তুলতে সবসময় সক্ষম নাও হতে পারে। বংশ পরিচয় দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা, উত্তরাধিকার, নিদেন বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া দৌলত, ঝকঝকে চেহারা, বিজাতীয় বুলি এবং কেন্দ্রের সঙ্গে পরিধি—পরিধির সঙ্গে ব্যাস—ব্যাসের সঙ্গে ব্যাসার্ধ, এবম্বিধ বহু বিচিত্র যোগ সূত্রের গিঁট—এসবের যৌথ বা যৌগিক মিশ্রনেই পার্সোনালিটি গড়ে ওঠে। এই মিশ্রনই আই কিউ বানায়। আই কিউ-এর ভালো একটা পরিভাষা পাওয়া গেছে যাই হোক—'বুদ্ধ্যঙ্ক'। মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করে বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে। বুদ্ধু বানাবার এর চেয়ে ভাল অংক এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এই অংকের খেলাতেই সাদা কাত করেছে কালোদের, ব্রাহ্মণ শূদ্রদের, শহরবাসী গ্রামকে, পুরুষ নারীকে এবং বড়বাবু চাপরাশিকে।

'পুরুষ-নারীর প্রসঙ্গে' একজন অপরজনকে টেক্কা দিতে চাইছেন। আমি আপাততঃ সে লোভ সম্বরণ করছি। তসলিমা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বলেছেন, যদিও তসলিমাকে যারা এদেশে স্পনসর করছে তাদের চেয়ে বোধহয় ততটা সংগঠিত ভাবে আর কেউ নারীকে পণ্য হিসাবে বিজ্ঞাপিত করেনি।

জাত-বর্ণ ভেদাভেদ তথা ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কথা ওঠায় অনেকেই ভ্রূকুঞ্চন করছেন। ঐসব ন্যক্কারজনক ব্যাপার তো কেবল বিহার, উত্তরপ্রদেশ তথা হিন্দি বলয়ের একচেটিয়া কারবার। আমাদের আবার ওসব পুরোনো বিষয় নিয়ে টানাটানি কেন? দৈনিক পত্রিকায় রবিবারের পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন আশা করি কারোর নজর এড়ায়না। যদিও ঘটনার ঘনঘটায় দৃষ্টিতে নাও আসতে পারে সেইসব খবর যেখানে দারুণ প্রগতিশীল জননেতা নাতির উপনয়ন উপলক্ষ্যে কার্ড পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করছেন সহযোদ্ধাকে। নামকরণ, মুখেভাত প্রভৃতি অনুষ্ঠানের তবু একটা অর্থ আছে কিন্তু উপবীত ধারণ অনুষ্ঠানকে নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রকাশ ছাড়া আর কিই বলা যেতে পারে জানিনা। জানি না এই অনুষ্ঠানের ভুরিভোজ খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে মূল্যবোধের চর্চা সম্ভব কিনা।

যুক্তি যখন কৃতকর্মকে অনুসরণ করে তখন ভুড়ু আর টামাক দুটোই খাওয়া যায়। একদিন রাস্তায় এক প্রাক্তন বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা—তিনি তাঁর চার বছরের শিশু পুত্রকে নিয়ে একটি নামী-দামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে ফিরছিলেন। প্রাথমিক স্তরের ইংরাজিই শুধু নয় একদা তিনি এই প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কী করে যে কলেজের অধ্যাপক বনে গেলেন জানিনা। যাই হোক আমি শিশুটিকে কিঞ্চিৎ আদর টাদর করে তার স্কুলের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। পিতা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একগাল হেসে বললেন, কী করবো বলো? বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করতে চেয়েছিলাম, তা যখন হল না তখন শিশুকেই বিশ্বের যোগ্য করে তুলছি।—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আসলে এক মর্মান্তিক গুণতন্ত্র চেপে বসেছে—আমাদের ভিতরে। কৃতি আর সফল ছাড়া আর সকলে সেখানে এলেবেলে। ডি এস সি, পি এইচ ডি, ডাক্তার, কণ্ট্রাক্টর, ভূস্বামী, কারখানার মালিক, সরকারী সেরেস্তাদার, কোটালপুত্র, উজির ও তার আড়কাঠি—এসবের দুঃসহ ওজনে ঘাড় মুখ তুলবার জো নেই গুণতন্ত্রের নির্বাক বাসিন্দাদের, যাদের সত্তর শতাংশ মহিলা কোনদিন সায়া পরেনি, আশি শতাংশ শিশু একেবারে উদোম, নব্বই শতাংশ একেবারে ওষুধ না খেয়ে ভুগে ভুগে মারা যান। এরা হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত—এদের কোনো গুণ নেই, কোনো কৃতিত্ব নেই। এরা গুণীদের শুধু যোগান দিয়ে যান—ডাক্তারবাবুর স্টেথো, উকিলবাবুর শামলা, কোটালবাবুর ব্যাটন, গুণতন্ত্রের সংসদ ভবনের ইঁট-কাঠ-পাথর। □ বিষ্ণু বিশ্বাস

('কানাকড়ি' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত)

কিছুদিন হল খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবর অনেকেরই চোখে পড়েছে। দমদম এলাকায় স্থানীয় মানুষজন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন একটি পুকুরকে বেআইনী ভাবে বুজিয়ে ফেলার বিরুদ্ধে। এই প্রচেষ্টার একদম সামনের সারিতে ছিলেন এলাকার নারীরা। আমাদের চারপাশে বন্ধুত্ব, সহযোগিতার ভিত্তিতে এরকম নানান কাজকর্ম ঘটছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। পরিবেশ দূষণ থেকে 'উন্নয়নের' নামে নীচের তলার মানুষের উপর আক্রমণ—এসব কিছু সম্পর্কে বহুস্তরেই সচেতনতা গড়ে উঠছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তা থেকে যায় প্রায় অদৃশ্য। আমাদের ইচ্ছে এইসব নানান প্রচেষ্টাকে যতটুকু সম্ভব প্রকাশ করা, সাহায্য করা, অবশ্যই আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে। তাই এবার আমরা প্রকাশ করছি তিনটি ছোট রিপোর্ট। আবেদন রাখছি এই ধরণের যে কোন লেখা আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য যাতে এই বিভাগটি চালু রাখা যায়।

পুকুর বোজানোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

চারপাশে যা দেখেছি : এক

ইছাপুর থেকে লিখছি

দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গার দুই তীরবর্তী অন্যান্য অঞ্চলেরই মতন ইছাপুর অঞ্চলটি অনেকদিন ধরেই জনসমাকীর্ণ। দুই বাংলার রাষ্ট্রীয় বিভাজনে উদ্বাস্তুদের বেশ কিছু অংশ এখানে ঘরবাড়ি তৈরী করে। এই অঞ্চলের জমি, পুকুর প্রভৃতি ফাঁকা অঞ্চলের ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ে 1962 সালের পর। ঐ সময় ভারত-চীন যুদ্ধের পর এই অঞ্চলে অবস্থিত অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে প্রচুর পরিমাণে লোক নেওয়া শুরু হয়। অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরীর উৎপাদনের মাত্রা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যাবার দরুণ, দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর লোক তখন এই ফ্যাক্টরীতে চাকরী পায়। স্টাফ কোয়ার্টারের অপ্রতুলতায় বাড়ি বানিয়ে থাকতে বাধ্য করান হয় এইসব কর্মীদের। এই অঞ্চলের ফাঁকা জায়গা ক্রমশঃ কমতে থাকে। চাষের জমি বাস্তু জমিতে এবং পুকুরগুলি ভরাট হতে থাকে।

ইছাপুর অঞ্চলের অন্যান্য পাড়ার মতনই দেবীতলা একটি মোটামুটি রকমের মাঝারি পাড়া। এই পাড়াটিতে 42 শতক পরিমাপের একটি মাত্রই পুকুর অবস্থিত। পুকুরটিকে সাধারণ মানুষরা স্নান প্রভৃতি গার্হস্থ্য কাজে ব্যবহার করে। খোলামেলা জায়গার অভাবে এই পুকুরটার চারপাশের ফাঁকা জায়গাটাকে অঞ্চলের একটু মুক্ত হাওয়া খেলার জায়গা হিসাবেও সাধারণ মানুষ ভাবত। এই এলাকায় দুর্ঘটনা জনিত কারণে হঠাৎ আগুন লেগে গেলে আগুন নেভাবার অপ্রতুল জলের যোগানদার হিসাবে এই পুকুরটাই একমাত্র ভরসা ছিল। সেটেলমেণ্ট অফিসে এই পুকুর সংক্রান্ত নথীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে এই পুকুরটি একমাত্র সাধারণের গার্হস্থ্য কাজের জন্য ব্যবহার্য।

আজ থেকে প্রায় 8/9 বছর আগে (1985) দেবীতলা অঞ্চলের লোকেরা হঠাৎ জানতে পারে এ অঞ্চলটির এক মাত্র এই পুকুরটি বোজানোর চেষ্টা চলছে। অঞ্চলের একজন জমির দালাল মহাদেব মুখার্জী সমস্ত রকম আটঘাট বেঁধে নেমেছে এই পুকুরটিকে বোজানোর কাজে। সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ, ক্লাব, দল নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই একমাত্র জলাশয়টিকে বাঁচাবার জন্য। সাধারণ মানুষের অনুরোধে সমস্ত রাজনৈতিক দল, কমিশনারগণ, পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় এম. এল. এ. সবাই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে সমর্থন ও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তখনকার মতন দুই এক লরি মাটি ফেলে দালালটি কাজ বন্ধ রাখে। এ ঘটনার তিন বছর পর 1988 সালে এই দালাল আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। এলাকার অধিবাসীরা মহকুমা শাসক এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে জয়েন্ট পিটিশন পাঠায়। সরকারী দপ্তর থেকেও বিশেষ ভাবে সাহায্য পাওয়া যায়। 13 আগস্ট 1989 সালে জমির দালাল আবার পুকুরটিকে ভরাট করার উদ্যোগ নেয়। 24.8.89 তারিখে মহকুমা শাসক এবং সরকারী দপ্তরে স্থানীয় অধিবাসীরা আবার সমস্ত অধিবাসীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পিটিশন পাঠায়। সেই সময়কার স্থানীয় এম. এল. এ, পৌরসভার চেয়ারম্যান, মহকুমা শাসকের সাহায্যে এই প্রচেষ্টা বন্ধ হয়।

এর কিছুদিন বাদে দালালটি অন্য পথ ধরে। পাড়ার কিছু লোক এবং ক্ষমতাসীন দলের একাংশকে তার কাজে লাগাবার চেষ্টা করে, যদিও ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বের প্রচেষ্টায় দালালটির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। একের পর এক ব্যর্থতায় দালালটি মরিয়া হয়ে বাইরের কিছু মস্তান নিয়ে এসে পুকুরটিতে দেওয়াল দেওয়ার কাজ শুরু করে দেয়। এই লড়াইয়ে সামিল হওয়া চারজন যুবকের নামে হাইকোর্টে ক্রিমিন্যাল কেস করা হয়। পাড়ার বেশ কিছু যুবকের প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। এইসব সত্ত্বেও পুকুরটিতে দেওয়াল দেওয়ার চেষ্টা সফল হয় না।

পরবর্তীকালে পুকুরটির ভার স্থানীয় পৌরসভা তুলে নেয়। পৌর সভার হাতে পুকুরটি চলে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ পুকুরটি সম্পর্কে বর্তমানে কোন তথ্যই আর জানতে পারে না। পৌরসভাকে বারবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও কোন সদুত্তর পাওয়া যচ্ছে না। দালালের সাথে গোপন বোঝাপড়ার আশংকা সাধারণ মানুষ একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। দেবীতলার মানুষ যদিও সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে এই পুকুরটির ব্যাপারে।

□ কাজল

চারপাশে যা দেখেছি : দুই

ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স থেকে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা

আমাদের এই সুন্দর গ্রহটিকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যখন সারা বিশ্বজুড়ে চলছে তোলপাড়, দূষণরোধে শুরু হয়েছে সচেতন প্রয়াস, গড়ে উঠছে বিরাট বিরাট আন্দোলন, ঠিক সেই সময়ে আমাদের এই পশ্চিম-বাংলায় একটা জীবনদায়ী খাল-কে পরিণত করা হয়েছে দূষিত, নোংরা জলের প্রবাহে—এককথায় নর্দমায়। জলের রং এখন কুচকুচে কালো, তাকালে রীতিমত ভয় হয়।

হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমান্ত-

রেখা টেনে কালীঘাটের কাছে গঙ্গা থেকে বেরিয়ে বালী আর উত্তরপাড়ার মাঝখান দিয়ে খালটি সোজা চলে গেছে ডানকুনির দিকে। খালটি কাটা হয়েছিল মূলতঃ সেচের প্রয়োজনে। কিন্তু সেচের প্রয়োজন ছাড়াও খালের দুপাশের গ্রামগুলোর অধিবাসীদের ঘর-গেরস্থালী থেকে শুরু করে স্নান পর্যন্ত নানা প্রয়োজন মেটাত এই খাল। কয়েকশো জেলে পরিবার এই খাল থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এখন সমস্ত কিছু বন্ধ। বছর সাত-আট আগে যেদিন থেকে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্সের বর্জ্যপদার্থ এই খালে এসে পড়া শুরু হল সেদিন থেকেই গ্রামবাসীরা আর এই খাল ব্যবহার করতে পারেন না।

ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি সংস্থা। এই কারখানাটিতে বর্তমানে কোল গ্যাস, আলকাতরা ইত্যাদি 11টি কয়লার উপজাত পদার্থ তৈরী হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও 26টি পদার্থ তৈরী হওয়ার কথা। হুগলী জেলার গোবরা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে দিল্লী রোড এবং হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় কারখানাটির অবস্থান। কারখানা থেকে আলকাতরা মেশানো তরল বর্জ্যপদার্থ প্রথমে এসে পড়ে কারখানার লাগোয়া বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে। এই জলাভূমির সাথে রয়েছে খালের সংযোগ। জলাভূমি থেকে খালে এসে পড়ছে তরল বর্জ্য-পদার্থ। জলাভূমিতে সদ্য এসে পড়া এই বর্জ্যপদার্থগুলি জলের ওপর সরের মতো ভাসতে থাকে। একদল ছেলেমেয়ে এই ভাসমান পদার্থগুলো সংগ্রহ করে বিক্রি করে। এদের অনেকেই আজ নানা রোগে আক্রান্ত। ডানকুনি কোল কমপ্লেক্সের দূষণে খালের ধারের ঘনবসতিপূর্ণ যে গ্রাম-গুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সেগুলো হলো—পার ডানকুনি, চাকুন্ডি, গোবরা, আখডাঙা, মনোহরপুর, মৃগলা এবং পার রঘুনাথপুর।

কথা হচ্ছিল আখডাঙা গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য শেখ সারাবতের সাথে। উনি বললেন—খালের জল ক্ষেতে ব্যবহার করার ফলে ফসলের ফলন কমে যাচ্ছে, চাষের ক্ষতি হচ্ছে। খালে এখন আর মাছ পাওয়া যায় না। গ্রামবাসীরা খালের জলে আর নামেন না। রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবিরাম কাঁড়ারকে জিজ্ঞেস করলাম —আপনারা পঞ্চায়েত থেকে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? উনি জানালেন— গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, রাজ্য সরকারের পরিবেশ দপ্তর এবং কারখানা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়ে-ছেন সমস্ত উপজাত পদার্থ অর্থাৎ মোট 37টা উপজাত পদার্থ তৈরী হলে আর বর্জ্যপদার্থ বেরোবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো সেটা কবে হবে? ততদিন পর্যন্ত এই রকম চলবে! এই ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষ নীরব। তারা দেখছি-দেখব করে সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন।

মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল ধর বললেন যে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্সের বর্জ্যপদার্থ ছাড়াও খালের দুপাশে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা অসংখ্য খাটালের গোবর আর নোংরা জলও খালটাকে দূষিত করে চলেছে। খালের নীচে গোবরের পুরু স্তর জমে গেছে। খালে নামলেই কোমর অবধি গোবরে ডুবে যায়।—কিন্তু আপনারা পঞ্চায়েত থেকে কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? গ্রাম-বাসীরা আপনাদের কিছু বলছে না? উনি জানালেন—মাস কয়েক আগে গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিয়েছে। পঞ্চায়েত থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা হয়েছে, কিন্তু একটা কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থার বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত কী করতে পারে?

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, রাজ্য সরকারের সেচ বিভাগ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে গত বছর এই খাল কাটালেন, অথচ একবারও ভেবে-দেখলেন না যে, যে খাল দূষিত নোংরা জল বহন করে নিয়ে যায় সেই খাল কাটিয়ে লাভটা কী? গ্রামবাসীরা ক্ষোভের সাথে বললেন—একমাত্র ঠিকাদারদের পকেট ভরা ছাড়া আর কারও কোন

লাভ হয় নি। সরকারী অর্থের অপচয়ের এটা একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তবে আশার কথা, বালির 'বিজ্ঞান সংসদ' এই দূষণরোধে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্সের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমস্ত বিজ্ঞান ক্লাবকে নিয়ে এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। □ অরুণ পাল

চারপাশে যা দেখেছিঃ তিন

শ'-ওয়ালেশ কোম্পানীর গ্যাস মানুষ আতঙ্কিত

তা প্রায় বছর তিনেকের কথা। পরিবেশ দূষণ নামক অক্টোপাসটা যখন দিনকে দিন সুস্থ জীবনের কণ্ঠরোধ করে চলেছে তখন উত্তরপাড়ার শখের বাজার অঞ্চলেই বা সেই থাবার অনুপ্রবেশ ঘটবে না কেন? সেই অভাব পূরণ করেছে শ'-ওয়ালেশ কোম্পানী কর্তৃক পরিত্যক্ত তীব্র, অসহনীয় দুর্গন্ধ যুক্ত গ্যাস—শিল্পসভ্যতার এক অভিনব উপহার।

এই গ্যাস ঠিক কি কারণে বের হচ্ছে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে শোনা যায় কোম্পানী জ্বালানীর খরচ কমাবার জন্য বিভিন্ন নোংরা পদার্থ সংগ্রহ করে তা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে চলেছে। এও শোনা যায় বিদেশী কোম্পানীর সাহায্যে গড়ে তোলা কোনো নতুন পরিকল্পনার ফলশ্রুতিই হল এই গ্যাস।

এই গ্যাস যে নির্দিষ্ট কোনো সময়ে ছাড়া হয় তা নয়। প্রথম দিকে যখন-তখন ছাড়া হত। পরে গভীর রাতে বা বেশ কিছুদিন জমিয়ে রেখে তারপর ছাড়া হয়। যেমন, উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তরপাড়া কোৎরং পুরসভার নির্বাচনের আগে বেশ কিছুদিন এই গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায়নি।

এই নির্বাচনের সময়েই প্রচারিত লিফলেটে এই গ্যাসকে এইচ টু এস (হাইড্রোজেন সালফাইড) বলে প্রচার করা হয়। পরবর্তীকালে হাইজিন থেকে এই গ্যাসকে পরীক্ষার জন্য যে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়, সেখান থেকেও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই গ্যাসকে এইচ টু এস বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এইচ টু এস গ্যাস মানবদেহের উপরে বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে। তাই সঠিকভাবে সনাক্ত করা না গেলে প্রকৃত কি ক্ষতি হচ্ছে তা বলা যাচ্ছে না। প্রায় এক থেকে দেড় কি মি দূরত্ব অবধি এই গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্যাসের প্রভাবে অনেক বাসিন্দারই অসুস্থতা অনুভূত হয়। অনেকে অভিযোগ করেন খিদে কমে যায়। তাছাড়া নিকটবর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধাতব পাত্রে (স্টেইনলেস স্টীলের পাত্রে নয়) কালো দাগ পড়ে।

শুধু বায়ুদূষণ নয়, কোম্পানী জলদূষণেও অগ্রসর হয়েছে। কোম্পানীর পাশেই গঙ্গা। সেখানে প্রায়ই তেল এবং বিভিন্ন ময়লা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে পার্শ্ববর্তী ঘাটগুলোতে মানুষরা স্নান পর্যন্ত করতে পারেন না।

এই দূষণের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ এবং কিছু সংগঠন বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রতিবাদ জানিয়েছে। কোম্পানীর সাথে আলোচনায় বসেছে নাগরিক কমিটি। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি। এমনকি একবার স্থানীয় যুবকরা গ্যাসের দুর্গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠলে কারখানার ভেতরে ঢিল ছুঁড়তে

আরম্ভ করে।

সম্প্রতি গ্যাসের তীব্রতায় একজন বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন কারখানার গেট অবরোধ করে। প্রায় ছ-ঘণ্টা তারা কোনো কর্মীকে ঢুকতে বেরোতে দেননি। কিন্তু কাজের কাজ ? কিস্যু না।

আমরা উত্তরপাড়া বিজ্ঞান ক্লাবের পক্ষ থেকে মিউনিসিপ্যালিটির কাছে গিয়ে জানতে পারি এই ধরণের ক্ষতি-কারক গ্যাস জনবহুল এলাকায় পরিত্যাগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোম্পানী স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জোগাড় করেছে। কোম্পানী নাকি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ায় গ্যাস কম বেরোচ্ছে। তবে কোম্পানী গ্যাস পুরোপুরি বন্ধ কখনোই করবে না। আমরা কর্তৃপক্ষের সাথে বহুবার আলোচনায় বসতে চাইলেও তারা রাজী হননি।

স্থানীয় এলাকার এক বিরাট অংশ কোম্পানীর ওপর নির্ভরশীল। কোম্পানী কর্মীদের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে ক্রমাগত, যে এই গ্যাস ক্ষতি-কারক নয়। কোম্পানী প্রচ্ছন্নভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে গ্যাস বন্ধ করার জন্য বেশি চাপ দিলে বন্ধ হবে কারখানা। আর তাহলে সবচেয়ে দুরবস্থার সম্মুখীন হবেন কর্মীরা। কর্মীরা আবদ্ধ হয়েছেন দুদিকের দু' সমস্যায়। আর শেষ পর্যন্ত তারা এই গ্যাসকে নির্বিষতার মুখোশ পরাতে চাইছেন।

এই গ্যাস সঠিক কি ক্ষতি করে তা 'আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু এই গ্যাস যে ভীষণ রকমের ক্ষতিকারক, অনুভূতি তাই বলছে। আর সেই জন্যই নাগরিকরা আতঙ্কিত না হয়ে পারছেন না। মানুষের সমস্যার জঞ্জালের পাহাড়ে সংযোজিত হয়েছে এক নতুন ঝামেলা। যার সমাধান একক ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গেলেও রয়েছে কারখানা বন্ধের ভয়। অন্যদিকে নির্বিকার সরকার। বিধানসভাতেও এই গ্যাস নিয়ে নিষ্ফল আলোচনা হয়েছে। সব মিলিয়ে তাই সাধারণ মানুষদের নিঃশর্তে 'জেনে শুনে বিষ' পান করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা।

☐ **উত্তরপাড়া বিজ্ঞান ক্লাব**

পঃ বঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তিকা

- হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (নিঃশেষিত)
- না হিরোসিমা নাগাসাকি চাই না
- বিজ্ঞানশিক্ষা প্রাথমিক হালচাল
- বিজ্ঞানশিক্ষা মাধ্যমিক হালচাল

সরকারী স্বাস্থ্য—একটি সমীক্ষা

মাঠে-ঘাটে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে একটা কথা প্রায়ই বলা হয়—হাসপাতাল, না ওটা নরক? কথাটা সত্যি না মিথ্যে, একটু যাচাই করে দেখা যাক্।

একটা কথা বলে রাখা ভাল—চমক দেখানো এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য নয়। তবে সমীক্ষায় হাসপাতালের সর্বাঙ্গীন চিত্র তুলে ধরার একটা চেষ্টা করা হয়েছে।—তাতে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট চমকে যেতে পারেন।

সমীক্ষার জন্য আমরা একটা বিভাগ বেছে নিয়েছি—শিশুবিভাগ। কারণ বেসরকারী বা আধা সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এই বিভাগটি খুব বেশী উন্নত নয়। তাই এখনও সরকারী হাসপাতালের শিশু বিভাগের গুরুত্ব আছে। আমরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগের ওপর একটা সাধারণ সমীক্ষা করি—তার সারাংশটির দিকে তাকালেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অবস্থা কেমন বুঝতে পারবেন।

সব দিক থেকে এত বড় শিশু বিভাগ এরাজ্যে খুব কমই আছে।

এর তিনটি ভাগ ঃ

1. একদম নবজাতকদের জন্যে নার্সারী।

2. মেডিসিন বিভাগ—শিশু-নিবাস মেডিসিন।

3. সার্জারী বিভাগ—শিশু নিবাস সার্জারী।

বেড কটা ?

বেডের সংখ্যা সব মিলিয়ে 160। সার্জারী তে 50টা বেড। এখানে বেশ মজার ব্যাপার চলে। খাতায় কলমে 50 জন রুগী মানে 50টা বেড। কিন্তু এই সব বেড খুঁজলে কখনোই তা 28 বা 30 এর বেশী পাওয়া যায় না। আসলে এখানে খুব কম বাচ্চার সাথেই মা বেডে থাকেন, বাকী বেডে বাচ্চা একলাই থাকে। ফলে একই বেডে দুজন—এমনকি তিনজন বাচ্চা-কেও রাখা হয়।

মেডিসিন বিভাগে বেড 75টা, নার্সারীতে বেড 35টা। আগে ছিল 55টা, দুটো ঘর মিলিয়ে। কিন্তু 25টা বেডের একটা ঘর অনেক দিন হল নষ্ট হয়ে গেছে। তার বদলে এখন ডাক্তার ও সিস্টারদের বসার ঘরে মাত্র 5টা বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসুস্থ নবজাতকদের খুব তাড়াতাড়ি আলাদা ঘরে রাখা উচিত। কিন্তু সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই, হাস-পাতালে মায়েদের পাশে বাচ্চার 'কট' (ছোট খাট) রাখার কোন ব্যবস্থা নেই।

ডাক্তার কজন ?

নার্সারী ও মেডিসিন বিভাগের জন্য ঃ—

ভিজিটিং ফিজিসিয়ান (বড় ডাক্তারবাবু)—3 জন। নার্সারীতে রোজ একজন পালা করে যান।

আর. এম. ও—1 জন (মেডিসিন)।

আর. এম. ও—1 জন (নার্সারী)।

সার্জারী বিভাগের জন্য ঃ—

ভিজিটিং সার্জন—3 জন

আর. এস—1 জন

হাউস স্টাফ ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের সংখ্যা ঃ—

	নার্সারী	মেডিসিন	সার্জারী
হাউস স্টাফ	2 জন	6 জন	2 জন
স্নাতকোত্তর ছাত্র	2 জন	6 জন	2 জন

স্নাতকোত্তর ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মাত্র 1 জন এম ডি ও 4 জন ডি সি এইচ ছাত্র প্রথম বর্ষের আছেন। কেবলমাত্র এঁরাই হাউস স্টাফ হিসেবে কাজ করবেন।

ইন্টার্নী ও সেবিকার সংখ্যা :

	নার্সারী	সার্জারী	মেডিসিন
ইন্টার্নী	7-8জন	2 জন	2 জন
সেবিকা	2 জন	2 জন	4 জন [মোট 6 জন পালা করে]
শিক্ষার্থী সেবিকা	4-5 জন	4-5 জন	10-12 জন

রুগী ভর্তির হার :

এখানে রুগী দুভাবে ভর্তি হয়—বহির্বিভাগ থেকে, আর এমাজেন্সী থেকে [যদি রুগীর অবস্থা খারাপ থাকে]। নার্সারীতে সাধারণভাবে সব নবজাতককেই প্রথমে আনা হয়, তারপরে অসুস্থদের চিকিৎসা বা পর্যবেক্ষণের জন্য রেখে, বাকীদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাই নার্সারীতে সুস্থ ও অসুস্থ বাচ্চা দুই-ই থাকে। তবে বাইরের ছোট হাসপাতাল বা সদর হাসপাতালের অসুস্থ বাচ্চাদেরও নিতে হয় নার্সারীতে। তাই গোটা শিশু বিভাগটিতে প্রচন্ড ব্যস্ততা। সেই তুলনায় ডাক্তার ও নার্সদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

নার্সারীতে ভর্তি হয় প্রায় 25 জন, সুস্থ ও অসুস্থ মিলিয়ে। এর মধ্যে থেকে গড়ে 5 জনকে প্রতিদিন রেখে দিতে হয় চিকিৎসা/পর্যবেক্ষণের জন্য।

মেডিসিন বিভাগে প্রায় 15 জন প্রতিদিন ভর্তি হয়। এর মধ্যে খুবই খারাপ অবস্থায় আসে প্রতিদিন 2-3 জন। বাকীরা আসে সাধারণ অসুস্থতা নিয়ে।

সার্জারী বিভাগে সপ্তাহে মাত্র দুদিন রুগী ভর্তি হয়, গড়ে 5-10 জন প্রতিবার। বেশীর ভাগই জরুরী (এমার্জেন্সী) নয়। ভর্তির দিন ছাড়া অন্য দিনে খুব সাংঘাতিক অবস্থায় কোন 'জরুরী' কেস এলে জেনারেল সার্জারী বিভাগে রাখা হয়। পরে শিশু বিভাগে বদলি করে দেওয়া হয়।

যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক-এর ব্যবস্থা :

	নার্সারী	মেডিসিন	সার্জারী
সাকার মেশিন (সুস্থ ও অসুস্থ বাচ্চাদের জন্য)	1+1	4	1
ঘর গরম রাখার যন্ত্র (এটির দরকার প্রচন্ড কারন বাচ্চারা প্রায়ই ঠান্ডা হয়ে যায়)	2+1	4 (সবকটাই অকেজো)	2
রেফ্রিজারেটর	1	1	1
যন্ত্রপাতি বীজানুমুক্ত করার মেশিন	1	1	1
অক্সিজেন সিলিন্ডার	5+3	7–8	3—4
ফোটোথেরাপী বা রশ্মি চিকিৎসার মেশিন (আগে ছিল 3+2)	1+1	×	×
আম্বু ব্যাগ	1	1	×
ল্যারিঙ্গোস্কোপ	1+1	1	1

নার্সারীতে নেই কোন ইনকিউবেটর, [যা ছাড়া পুরো মাসে জন্মায়নি এরকম বাচ্চাদের বাঁচানোই মুশকিল], ওয়ার্মার, কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস চালানোর মেশিন বা ভেন্টিলেটর নেই, জন্ডিস মিটার নেই। যাঁরা ওয়াকিবহাল, তারা জানেন এই জিনিসগুলোর গুরুত্ব। নেই-এর বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। যা আছে দশ বছর আগেও তাই ছিল। যত যন্ত্র খারাপ হয়ে আছে, তা সারিয়ে ঠিকঠাক রাখতে পারলেই অনেক আশা পূরণ হবে।

মৃত্যুর হার :

নার্সারী—ভর্তি হওয়া নবজাতকদের মধ্যে থেকে প্রায় প্রতিদিন 1-2 জন [5 জনের মধ্যে] অর্থাৎ 20-40%

কারণ ইনফেকশন

জন্মানোর সময় কম ওজন

অ্যাসপিরেশন

মেডিসিন—প্রতিদিন 1-2 জন, 5-10%

সাধারণভাবে নবজাতকরাই

বেশী মারা যায় কারণ উপরিল্লিখিত।

বড় বাচ্চারা কম মারা যায়।

সার্জারী—0-5%

সাধারণভাবে জরুরী অস্ত্রোপচারের পর।

আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত। সমস্ত বড় হাসপাতালে নার্সারীটি প্রসবের ঘরের সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু এখানে নেই, যদিও দুটি বিভাগ একই বাড়ীতে। জন্মাবার সময় কোন অসুবিধা হলেও তার চিকিৎসা শুরু হয় অনেক দেরীতে। কারণ কল বুক নার্সারীতে যায় সেখান থেকে ডাক্তার এসে দেখে ওখানে যা করা সম্ভব করে নার্সারীতে নিয়ে যেতে বলেন। বাচ্চা নার্সারীতে গেলে আসল চিকিৎসা শুরু হয়। অবশ্য ততক্ষণ যদি বাচ্চা বেঁচে থাকে তবেই।

কোন নিওন্যাটোলজিষ্ট শিশু বিভাগে নেই—অথচ হাজার হাজার নবজাতকের চিকিৎসা হচ্ছে শিশুরোগের ডাক্তারদের দিয়ে। এই ধারণা 25 বছর আগে পালটে গেছে, শুধু এই হাসপাতালে পালটায় নি।

কোথাও রাতে জি ডি এ-রা থাকেন না অথচ ডিউটিতে থাকেন। সমস্ত কাজ ডাক্তার আর নার্সদের করতে হয়।

পরিচ্ছন্নতা :

অন্যান্য ওয়াডের্র তুলনায় পরিষ্কার। সাধারণ ভাবে যেখানে বাচ্চার সাথে মা থাকেন, সেখানেই বেশী অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন।

রোজ একবার করে মোছা হয় ও দুবার ঝাঁট দেওয়া হয়। ওয়াড ধোয়া হয় মাসে একবার কি দুবার।

তবে প্রতি বেডেই আরশোলাদের অবাধ বিচরন। ছোট বাচ্চাদের মাঝে মাঝেই কামড়ে দেয়। মশাও আছে। ভর্তি হওয়া বাচ্চাদের প্রায়ই ম্যালেরিয়া হয়। এর দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আছে বলে মনে হয় না—তারা গত দশবছরে একই রকম উদাসীন।

ওষুধ :

সরকারী সরবরাহ মাত্র 32টি ওষুধের। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি আবার বাচ্চদের জন্য ববহার করা যায় না। বাচ্চাদের জন্য বড়ির বদলে সিরাপের যে সামান্য ব্যবস্থা থাকলে সুবিধা হত, তাও নেই।

ভর্তি করা কোন বাচ্চার চিকিৎসার জন্য ওষুধ বাইরে থেকে কিনে আনতে বলতেই হয়। সাধারণ অসুখে গড়ে প্রায় 100 টাকা প্রতিদিন।

এখানে যারা চিকিৎসা করায়, তারা খরচ চালাতে পারেনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। তখন ফিজিসিয়ানস্ স্যাম্পল দেওয়া হয়, তারপর প্রায়ই চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়।

ইনজেকশনের জন্য কাঁচের সিরিঞ্জ প্রায় উঠেই গেছে। সবই ডিসপোজেবল। তবে তার সরবরাহ এত কম, ওটাই পরিষ্কার করে আবার ব্যবহার করা হয়। এর ফলে যা যা ক্ষতি হওয়া সম্ভব, সবই হয়। কর্তৃপক্ষ উদাসীন—যেন এমনটাই তো হওয়া সম্ভব।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা :

সামান্য কিছু পরীক্ষা বিনা পয়সায় হয়. যেমন সাধারণ রক্ত-পরীক্ষা, এক্সরে; এছাড়া সব কিছুর জন্য পয়সা দিতে হয়। পরীক্ষার গুণগত মান খুবই খারাপ। প্রায়ই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করা সম্ভব হয় না। তখন বাধ্য হয়ে পাঠাতে হয় বাইরে।

জরুরী পরীক্ষার ব্যবস্থা 24 ঘণ্টা নেই। তাই সন্ধ্যে 7টায় কোন রুগী ভর্তি হলে, পরদিন সকালের আগে কোন জরুরী পরীক্ষা করা যায় না বা বাইরে থেকে করাতে হয়। শুধু 24 ঘণ্টা এক্সরে হয়। এক কথায় হাসপাতালের ল্যাবরেটরী আছে না নেই এটাই বিতর্কের বিষয়।

গত 10 বছরে এতটুকু উন্নতি হয়েছে বলে কেউ মনে করতে পারেন না। শুধু বছর বছর দেওয়াল রং হয়—চাকচিক্য বাড়ে। মৃত্যু-হার-এর এই অস্বাভাবিকতা কাউকে ভাবায় বলে মনে হয় না।

কোথাও কোনও বিশ্লেষণ বা সমালোচনা করে ভুল ত্রুটি শুধরে

নেওয়ার চেষ্টা নেই। নেহাতই অবহেলায় একটা বিভাগ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

* এতক্ষণ ধরে যে ছবি দেখলেন—তার ওপর গত তিন বছরে স্বাস্থ্য দপ্তর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ "ঘটনা" ঘটিয়েছেন।

* '91 তে হঠাৎ করে 112টি ওষুধ সরবরাহ কমিয়ে 32টি করে দেওয়া হল।

* '92 তে হঠাৎ আউটডোর টিকিট ও প্রায় সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর দাম ধার্য করে বসলেন।

* '93 তে যারা হাসপাতালের প্রায় সব কাজ করে হাসপাতাল চালায় সেই হাউসস্টাফদের সংখ্যা কমিয়ে দিলেন।

পরের বছরগুলোতে হয়ত আরও অনেক 'ঘটনা' ঘটবে কেন্দ্রীয় সরকারের ভেঙে পড়া অর্থনীতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের দোহাই দিয়ে। তারপর একদিন হাসপাতালটাই সাধারণ লোকের কাছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, যেমন আজকের ট্রাম হয়েছে। জনমত বলবে হাসপাতাল উঠে যাক্, বা বলানো হবে। সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার লালবাতি জ্বলে উঠবে—শুধুমাত্র বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মুখ চেয়ে। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের সর্তসমূহ এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা নেবে। লোকে বিরক্ত হয়ে বলবে—যাক্ একটা 'নারকীয়' আপদ বিদায় হয়েছে।

তাই আমাদের মনে হয় সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার, একে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করার সময় আজই—কাল হয়ত বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

['মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা' নিয়ে আলোচনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক বিগত 27. 8. 93 তারিখে স্টুডেন্টস হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে মেডিক্যাল কলেজের কিছু হাউসস্টাফ-ইন্টার্নীর পক্ষে যে বক্তব্য রাখা হয়েছিল, এই প্রতিবেদন তারই অনুসরণে তৈরী।]

একটি আবেদন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে।

1994 সালের জন্য গ্রাহক হোন।

গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক 16 টাকা।

(বিশেষ ক্ষেত্রে বার্ষিক 10 টাকা।)

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে স্পষ্ট ভাবে নাম-ঠিকানা লিখবেন। প্রযত্নেঃ অভিজিৎ লাহিড়ী □ পি 252 লেকটাউন □ ব্লক এ, কলিকাতা পিন ঃ 700089।

* পত্রিকা ডাকে পাঠানর ব্যবস্থা আছে।

কিস্যা ক্যাকটাস অর্কিড কা

অনুবাদ

সময়টা 1982-র ফেব্রুয়ারী। ফোনিক্স দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসা এক বন্দুকওয়ালা ডেভিড এস গ্রান্ড-ম্যান আমেরিকার অ্যারিজোনা মরুভূমিতে গিয়ে প্রায় 27 ফিট উচ্চতার কাঁটাওয়ালা সাগুয়ারা ক্যাকটাসগুলোকে দেখে এবং তার হঠাৎ ইচ্ছে হয় এদের ওপর গুলি চালাতে। মাত্র কয়েক ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে মাটি থেকে চার ফুট উচ্চতার মধ্যে নিজের মনঃসংযোগ বজায় রেখে গ্রান্ডম্যান গাছগুলির গায়ে গুলি চালাতে শুরু করে। একবার দুবার তিনবারেই অঘটনটা ঘটল। গ্রান্ড-ম্যানকে হতচকিত করে বাকি 23 ফিটের কাঁটাওয়ালা গাছটা সোজাসুজি এসে পড়ল তার ঘাড়ে। গ্রান্ডম্যান প্রাণ-পনে পালাতে চাইল। কিন্তু না, ততক্ষণে গাছ এবং কাঁটা তাকে মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরেছে। ফোনিক্স হাসপাতালে পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রান্ডম্যান মারা যায়।

অ্যারিজোনার জাতীয় উদ্ভিদ এই সাগুয়ারা ক্যাকটাস অবশ্যই বিলুপ্ত প্রজাতির একটি। প্রায় 25 বছর সময় লাগে বীজ থেকে একটা গাছকে বড় করে তুলতে। এবং এই সময়ের মধ্যে অনেক ক্যাকটাসই হয় পচে যায়, নয়তো নেহাতই নষ্ট হয়। উদ্ভিদ-বিদ লাইমান বেনসন এর ভাষায়—'উদ্ভিদ-কুলের মধ্যে একমাত্র এই ক্যাকটাসই হল সবচাইতে দ্রুত বিলুপ্ত-প্রায় প্রজাতি।'

যে জিনিস যত দুর্লভ, তার দামও তত বেশী। বিশেষতঃ কালোবাজারে। এক একটা ক্যাকটাসের দাম ওঠে 25 থেকে 1000 ডলারের মত। আর সেজন্যই একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ ডলারের এক বে-আইনী চক্র—আমেরিকা, জাপান এবং জার্মানী হল যার ধারক-বাহক। 1979তে পশ্চিম জার্মানীর একটা চোরা দলই 6 হাজার বিরল প্রজাতির ক্যাকটাস বিশ্বের বাজারে বিক্রী করে, এবং আমেরিকার মাত্র একজন ডিলারের মাধ্যমেই প্রতি মাসে এক লক্ষ ক্যাকটাস জাহাজ পথে পাচার হয়ে বিশ্বের কালোবাজার ঘুরে চলে যায় বড়-লোকের সুদৃশ্য ড্রইংরুমে।

আসলে ক্যাকটাস নিয়ে এতগুলো কথা বলার একটাই কারণ, মরুভূমির জীবনে এরাই মূল প্রাণকেন্দ্র। এদের ঘিরেই বেঁচে থাকে একাধিক উদ্ভিদ ও প্রাণী। হাজারে হাজারে ক্যাকটাসকে তার বাসভূমি থেকে উপড়ে ফেলার অর্থ মরুভূমির বাস্তুতন্ত্রের এক ভয়ংকর ধ্বংস ডেকে আনা—যার থেকে মুক্তি নেই মানুষ নামধারী জীবগুলোরও।

1980 তে অ্যারিজোনা সরকার বিরল প্রজাতির ক্যাকটাসগুলোকে পাহারা দেবার জন্য 7 জনের একটি দল তৈরী করে। এদেরই একজন রিচার্ড কার্নাট্রম্যানের কথায়— 'প্রতিদিন আমাদের ভয়ংকর সব সমস্যার মুখো-মুখি হতে হয়। মেক্সিকোর সীমানা দিয়ে মদ বে-আইনী জিনিস পত্র এবং ক্যাকটাস পাচারের সময় গোলাগুলির বিনিময় তো এখন জল ভাত। খুন জখম তো হামেশাই ঘটে। ক্যাকটাস পাচারকারী হিসেবে চিহ্নিত এরকমই এক তাবড় ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোর্টে সাক্ষী দিতে যাবার আগেই পুলিশ অফিসার পুরো হিন্দী সিনেমার কায়দায় গুলিবিদ্ধ হয়।'

দামী প্রজাতির গাছপালা সংগ্রহ করা যাদের নেশা এবং পেশা তাদের চাহিদা মেটাতেই ভারত, লাতিন আমেরিকা, দঃ পূর্ব এশিয়া এবং দঃ প্যাসিফিক অঞ্চলের হাজারে হাজারে দুর্লভ অর্কিড এবং বিরলতম প্রজাতির গাছপালাকে তার বাসভূমি থেকে টেনে হিঁচড়ে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষিত করে বায়ুপথে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় বিশ্বের কালোবাজারে। শুধুমাত্র ভারতেই চোরাবাজারের চাহিদা মেটাতে বছরে কমপক্ষে 10টা প্রজাতির অর্কিড সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে একান্ত অসহায় ভাবে প্রায় 99% অর্কিডই মারা পড়ে মাসখানেকের মধ্যেই। ভিন্ন পরিবেশে এরা বংশগতির ধারাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারেনা। ফলে শুধু মাত্র নিজস্ব বাসভূমি থেকে উৎপাটিত হয়েই নয়, এমন এক সময় আসবে যখন এই গ্রহে অর্কিডের আর কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিশ্বের সবচাইতে বড় ফুল দেয় কোন গাছ ? সাধারণ জ্ঞানের বই পড়া যে কোন ছাত্র-ছাত্রী চট্ করে উত্তর দেবে **র‍্যাফ্লেশিয়া, আরনল্ডি**। সুমাত্রা দ্বীপবাসী এই গাছটার এক একটা ফুলের ব্যাস 3 মিটারেরও বেশী। তবে হ্যাঁ, এর অস্তিত্ব এখন শুধুমাত্র বই-এর পাতাতেই, মাটিতে নয়। ছোটবেলায় পড়া ক্যারোলিনাস লিনিয়াসের সেই বিখ্যাত 'ভেনাস পতঙ্গ-ফাঁদ' এবং অ্যালবামা দ্বীপের 'কেনব্রেক কলস উদ্ভিদ' বাজারী পণ্যের দৌলতে এখন শুধুই একটা নাম, কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নয়। ডোমেনিকার **ওয়াইন পাম** গাছের কাণ্ডে ছুরি চালানো হয়েছিল শুধুমাত্র মদের জন্য। আর এ'হেন নেশার যোগান দিতে 1926 সালে সর্বশেষ পাম গাছটিও মারা পড়ে। মানুষের এই অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের ফলে আজ প্রায় 20,000 প্রজাতির উদ্ভিদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ হারিয়েছে তার 300 দেশীয় প্রজাতির গাছপালা এবং 800 প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। নেপোলিয়ানকে যেখানে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেই দঃ অতলান্তিকের সেন্ট হেলেনা দ্বীপপুঞ্জ তার 100টা প্রজাতির গাছপালার মধ্যে মাত্র দুটোকে কোন-ক্রমে বাঁচাতে পেরেছে। আর আমাজন এলাকার তো কথাই নেই, এখানে প্রতিদিন প্রতি বর্গমাইলে 600 প্রজাতির গাছপালা মারা পড়ে।

তালিকা আরও বাড়ানো যায়, কিন্তু তাতে লাভ কি ? মানুষের আকাশচুম্বি খেয়াল খুশির দাবি মেটাতে প্রতিনিয়ত নির্বিচারে বনভূমিকে দুমড়ে মুচড়ে ধ্বংস করে বাস্তুতন্ত্রকে নিঃশেষে নিংড়ে ফেলার অর্থ বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ ডেকে আনা। শুধুমাত্র বনভূমি ধ্বংসের কারণেই '60এর দশকের বন্যা 50 লক্ষ জন-গোষ্ঠির বাস্তু জমি নষ্ট করে এবং '70এর দশকে ধ্বংসের সংখ্যা দাঁড়ায় 1 কোটি 50 লক্ষে। সংখ্যাটা '90এর দশকে কত দাঁড়াবে কে বলতে পারে। ট্রপিক্যাল বনভূমির ওপর নির্ভরশীল পৃথিবীর জনসংখ্যার 25% মানুষ আজ সম্পূর্ণ নিঃস্ব, নিরন্ন কারণ ব্যাপক হারে বন্যা, ভূমিক্ষয়, ফসল নষ্ট, ধস নামা, প্রাকৃতিক নদী-নালার শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা তাদের নিজস্ব বাসভূমিকেও বসবাসের অনুপযোগী করেছে। বনজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল পাহাড়ী মানুষগুলোকেও তাই জোর করে ভিন্ন পরিবেশে সমতলভূমিতে নিয়ে আসার খেলা চলেছে। আহা-রে, দেশে দেশে পরিবেশ নীতির কি গরিমা! শুধু উদ্ভিদ ও প্রাণীই নয়, মানুষকে নিঃশেষে তার বাসভূমি থেকে নির্মূল করা হচ্ছে। যার শেষ কথা একদা স্বনির্ভর মানুষগুলোর আধুনিক সভ্যতার দৌলতে নিঃশেষে ভিখিরীতে পরিণত হয়ে যাওয়া।

□ সংকলন ও অনুবাদ—**কাজল রায়**

□ গ্লোবালাইজেশনের প্রয়োজনে

জলা-এলাকাতেই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টার

পরিক্রমা ঃ এক

কলকাতায় একটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টার (ডব্লিউ টি সি) চাই। এবং সেটা পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলেই হতে হবে। এই মর্মে কলকাতা হাই-কোর্টে ডেভেলপমেণ্ট কনসালটেণ্ট লিমিটেড (ডি সি এল) আগে যার নাম ছিল ডি সি পি এল, এর পক্ষে সওয়াল করলেন কলকাতার প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী যিনি পঃ বঙ্গ থেকে নির্বাচিত এখন লোকসভার এম পি-ও বটে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও প্রস্তাবিত ডব্লিউ টি সি-র সহযোগী। তাদের তরফে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করছেন রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল শ্রী নরনারায়ণ গুপ্ত। মামলার প্রতিপক্ষ হল কলকাতার একটি নাগরিক সংস্থা—। পিপল ইউনাইটেড ফর বেটার লিভিং ইন ক্যালকাটা বা সংক্ষেপে 'পাবলিক।' যাদের দাবী হল কলকাতার পরিবেশ-ভারসাম্যের প্রয়োজনে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি যেমন আছে সেভাবেই সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘটনার শুরু দু-তিন বছর আগে। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই এই পত্রিকার পাতাতেও এ নিয়ে লেখাপত্র হয়েছিল। ঘটনাবলী এইভাবে গড়িয়েছে ঃ অনেক দিন ধরেই জলা এলাকার ভেড়িগুলি বুজিয়ে জমি তৈরির প্রয়াস চলছিল নানান অছিলায়, এরকম অনেক ভেড়ি-ই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। একসময় ল্যাণ্ড ডেভেলপার এবং বিল্ডিং প্রোমোটারদের নজর পড়ে এই এলাকার ওপর। শঙ্কিত হয়ে ওঠেন স্থানীয় লোক-জন। স্থানীয় লোকজন বলতে মূলতঃ মাছচাষের ভেড়িগুলির শ্রমজীবি মানুষ। অতএব ভেড়িগুলি থাকা না-থাকার ওপর তাদের রুজি-রোজগার তথা অস্তিত্ব নির্ভর করছে। এরই মধ্যে একদিন সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জানা গেল কলকাতার ডি সি এল নামক একটি সংস্থা এই ভেড়ি এলাকাতেই একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টার স্থাপন করতে চলেছেন। এই মর্মে রাজ্য সরকারের অনুমোদন তারা পেয়ে গেছেন। এবং প্রয়োজনীয় জমিও বরাদ্দ হয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় মানুষদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে জলাভূমি রক্ষার আন্দোলন। কলকাতার বিভিন্ন নাগরিক সংস্থা এগিয়ে আসে এই আন্দোলনের সমর্থনে। ভেড়ি মজদুরদের দাবী-দাওয়ার সাথে যুক্ত হয় নতুন বিষয় —কলকাতার দূষণ সমস্যার বিষয়। জলাভূমি এলাকার অস্তিত্বের সাথে কলকাতা শহরের পরিবেশ অনেকখানি নির্ভরশীল।

কলকাতার বায়ুদূষণ প্রতিরোধে জলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইতিমধ্যেই বায়ুদূষণের চাপে শহর কলকাতা ধুঁকছে। এক দিকে এর বিশাল জনসংখ্যার চাপ। অন্য দিকে শহরময় ছড়িয়ে থাকা অজস্র কলকারখানা নিঃসৃত বিপজ্জনক গ্যাসের বোঝা। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান যানবাহন নিঃসৃত ডিজেল-পেট্রোলের ধোঁয়া তো আছেই। এর মধ্যে শহর কলকাতার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ওই খোলামেলা জলা জমিটুকু কলকাতার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ। এই অঞ্চলটিকে যদি কংক্রীটের জঙ্গলে ভরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শহরবাসীকে একদিন দম

বন্ধ হয়েই মরতে হবে। এই আশংকা থেকে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। দৈনিক পত্রিকার পাতায় তার প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা ডি সি এল কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত মতামতে কান দেন না।

এমন অবস্থায় কলকাতার 'পাবলিক' নামক নাগরিক সংস্থা ওই প্রকল্পের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করার আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সাময়িকভাবে প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার আদেশ দেয় কোর্ট। এর বিরুদ্ধে পাল্টা আবেদন করেন ডি সি এল কর্তৃপক্ষ। সেই মামলারই শুনানী শুরু হয়েছে সম্প্রতি। ডি সি এল কর্তৃপক্ষের তরফে কোর্টে শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জী এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আমাদের দেশের পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সবিস্তারে বলেছেন।

তিনি বলেছেন প্রস্তাবিত এই ডব্লিউ টি সি হল শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য লেনদেনের একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। ফলে ভিন রাজ্য তো বটেই তামাম দুনিয়ার নানান প্রান্ত থেকে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধিরা এই কেন্দ্রে আসবেন, থাকবেন, তথ্য নেবেন-দেবেন। এদের আপ্যায়নের জন্য গড়ে তোলা হবে আনুষঙ্গিক উপকরণ। যেমন আন্তর্জাতিক মানের হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক। এখানে থাকবে সর্বাধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন চিকিৎসা কেন্দ্র। (কাজের চাপে অতিথিরা অসুস্থ হয়ে পড়বেন এই আশংকায়?) এছাড়া থাকবে আধুনিক আবাসন কেন্দ্র (কাদের জন্য—যারা আসবেন তারা কি আর ফিরবেন না?), সায়েন্স সেন্টার, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। একটি স্থায়ী বাণিজ্য মেলাও তৈরী হবে। এজন্য ডি সি এল-কে বরাদ্দ করা হয়েছে 73 একর জমি। আর রাজ্য সরকার নিজের হেফাজতে নিচ্ছেন 187 একর। প্রাথমিক ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে 90 কোটি টাকা। দাবী করা হয়েছে 10,000 মানুষের চাকুরীর সংস্থান হবে এখানে। এবং এতে কেবল কলকাতা-ই নয়—উপকৃত হবে দেশের গোটা পূর্বাঞ্চল। তবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যা কিছুই করা হোক তা পরিবেশের ভারসাম্যের কথা মাথায় রেখেই করা হবে। অতএব কলকাতার পরিবেশের ভারসাম্য বিপন্ন হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অর্থাৎ তিনি শুধু ট্রেড সেন্টার নয়—গোটা এলাকার একটা ভবিষ্যৎ চিত্র দিয়েছেন। মোটর চলার রাস্তা আর বিদ্যুতের ব্যবস্থাটুকু করলেই বাদ-বাকিটার জন্য বিশেষ উদ্যোগ দরকার হবে না। জমির হাত বদল থেকে শুরু করে শহর গড়ে ওঠা অবধি গোটা ব্যাপারটাই নিজের নিয়মেই চলবে। পরিবেশের ব্যাপারটাও সে অনুযায়ী বদলে যাবে—ওনার সদিচ্ছা বা আশ্বাস সত্ত্বেও।

সওয়ালের এই অংশটি নিছক তথ্যের দিক। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ট্রেড সেন্টারের পক্ষে ওনার যুক্তিটি। কারণ তিনি নিছক একজন আইন ব্যবসায়ী-ই নন। একজন সর্ব-ভারতীয় নেতাও বটে। এবং সর্বোপরি বামপন্থী নেতা। এছাড়া এই প্রজেক্টের সহযোগী হিসেবে রয়েছে পঃ বঙ্গের বামপন্থী সরকারও। তিনি এই সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলছেন—আধুনিক ব্যবসা তথা বাজারের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল আরো বেশী বেশী 'গ্লোবালাইজেশন'। 'দ্য মডার্ন বিজনেস ট্রেন্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু-ডে ইজ গ্লোবালাইজেশন'। আমাদেরও এর সাথে তাল রেখে চলতে হবে। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই 'গ্লোবালাইজেশনে'র অজুহাত বা বলা ভাল 'মনমোহিনী' অজুহাত। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং-কেও বলতে শুনি একই কথা। 'গ্লোবালাইজেশন' বটিকা সকলেই খেয়ে বসে আছে দেখছি!

সে যাই হোক—এ নিয়ে আমাদের বলার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু যে প্রশ্নে এই মামলা, ভদ্রলোক সে দিক মাড়ালেনই না দেখছি। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আমাদের পক্ষে জরুরী। এবং বোম্বাই দিল্লীতে যখন বসে গেছে তখন আমাদের এখানেই বা কেন হবে না? এই সমস্ত যুক্তি ধরে নিলেও কেন সেই সেন্টারটিকে গরীব-গুর্বোদের করে খাওয়ার জায়গা সেই জলা এলাকাতেই হতে হবে—বোঝা গেল না। জানিনা এর উত্তর কার কাছে গেলে মিলবে! □

□ নর্মদা বাঁধ প্রকল্প

টাকা ঢালুন—এবং লাখোপতি হোন

পরিক্রমা ঃ দুই

মাত্র ছত্রিশ'শ টাকা লাগাতে হবে। বিনিময়ে পাওয়া যাবে এক লক্ষ এগারো হাজার টাকা। ঠিক কুড়ি বছরের মাথায়। গুজরাট সরকারের নর্মদা নিগম লিমিটেড এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছে কাগজে। বণ্ড ছেড়েছে বাজারে গত নভেম্বর '93 থেকে। পাতা জোড়া বিজ্ঞাপনে লাখোপতি হওয়ার হাতছানি। জানিনা কতজন 'উড্‌বি লাখোপতি' লাইন লাগিয়েছেন এই বণ্ড কিনতে।

নর্মদা নিগম লিমিটেডের পরিচিতি নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই। এই হল সেই কোম্পানীক'টার একটি যারা জনগণের সেবায় নিয়োজিত! জনগণের জন্য সেচের জল, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিনিময়ে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করতে হবে জনগণকে। তিনটে বাঁধের জন্যই লাখ তিনেক লোককে নর্মদা উপত্যকা থেকে জমি-জমা বাস্তু-ভিটে ছেড়ে অন্যত্র উঠে যেতে হবে। পুরো প্রকল্পের বাকি বাঁধের হিসেব তো এখনও জানাই নেই। এই সামান্য (!) ক্ষতির জন্য যৎসামান্য ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে। আর বন-জঙ্গল, পশু-পাখী তথা প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর ধাক্কার ব্যাপারটা রাজনৈতিক নেতারাই সামলাবেন বলে মনে হচ্ছে। সেজন্য যত ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে বলবেন—তারা দেবেন। মিটিং মিছিল সেমিনার ওয়ার্কশপের জন্য গ্রাণ্ট দেবেন। চাই কি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিবেশ বিজ্ঞানের ওপর পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সও খুলে দেবেন। অতএব পরিবেশ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই!

এই অবধি ভালই চলছিল। প্রজেক্টের কাজ শনৈঃ শনৈঃ এগুচ্ছিলও। হঠাৎ বাগড়া দিয়ে বসল প্রজেক্টের সবচেয়ে বড় দালাল—খোদ বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তারা হাত গুটিয়ে নিতে চাইল মাঝপথে। কি কারণে কে জানে? তবে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের নামে স্থানীয় দরিদ্র আদিবাসী কৃষকদের ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপারটা বড্ড বেশী জানাজানি হয়ে গেছে দুনিয়া জুড়ে। সেই সব দেখে শুনেই কি না কে জানে বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পে টাকা লাগানোর মতলব ত্যাগ করল। সকলের মনে প্রশ্ন তাই—'কি হল, কি হল?—বিশ্বব্যাংকের লজ্জা হল!'

ইতিমধ্যে তো ইঞ্জিনীয়ার অফিসার ঠিকেদার প্রোমোটাররা কাজে হাত লাগিয়ে ফেলেছে। এতদিন যাহোক একটাই ঝক্কি ছিল—নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন'। তার সাথে জুটল বিশ্বব্যাংকের ফ্যাকড়া। প্রকল্প তাই ডুবু ডুবু। অবশেষে এই মরিয়া প্রয়াস।—ঘোষণা করল বাজারে বণ্ড ছেড়ে টাকা তুলবে কোম্পানী। এতদিন ছিল কেবল প্রকল্পের ধোঁকা। যোগ হল বণ্ডের গোলকধাঁধাঁ। অর্থাৎ কেবল জলেই নয় অন্যভাবেও ডোবানোর ধান্দা!

বিজ্ঞাপনটি নিশ্চয়ই সকলে দেখেছেন। এতবড় পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন নজর এড়িয়ে যাবার নয়। এক পাশে বিশাল বড় বড় হরফে দেওয়া হয়েছে মাত্র কয়েক শ টাকা দিয়ে কত লাখ মিলবে তার হিসেব। আর ডান ধারে বেশ ছোট ছোট হরফে দেওয়া ছিল

বিশেষ গুরুত্ব নেই এমন কিছু তথ্য! যেমন—বলা ছিল প্রকল্পের ব্যয় ও সময় সীমা বাড়তে পারে। প্রসঙ্গক্রমে জানানো হয়েছে বর্তমানে অনুমিত ব্যয় ন'হাজার কোটি টাকা। যেটা '86-'87 সালে ছিল সাড়ে ছ'হাজার কোটির মত। অতএব আগামী দিনে কি হারে প্রকল্প ব্যয় বাড়বে বিনিয়োগকারীরা নিজেরাই হিসেব কষে নিতে পারবেন। এর পরের তথ্য হল—প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের কাজ এখনও মেটেনি। অপ্রতুল ক্ষতিপূরণের কারণে প্রচুর মামলা আদালতে ঝুলছে। আদালতের রায় বেরোনো অবধি বাড়তি দায়ভার কত দাঁড়াবে অনুমান করা যাচ্ছে না। যদিও ছোট ছোট হরফের গুটি কয়েক শব্দের মাধ্যমেই বোঝান হয়েছে—শুরুতে কিভাবে প্রায় ফোঁকটেই ব্যাপারটা সারতে চেষ্টা করেছিলেন তারা। মাঝখানে 'নর্মদা আন্দোলন' সমস্ত ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দিয়েছে। তবু 'হবু-বিনিয়োগকারী'দের যথেষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'বিনিয়োগকারীরা ঘাবড়াবেন না। শুরুতে জমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছিল এক দশমিক ছয় (1·6%) শতাংশ। আদালতের রায়ে তা কত আর বাড়বে? বড় জোর আর এক শতাংশ?—অতএব মাভৈঃ বন্ড ক্রেতাগণ'।

জানিনা এত কিছুর পরও প্রকল্প যদি মার খায় তখন কি হবে। ইতিমধ্যে 'ইঞ্জিনীয়ার—অফিসারদের-কর্মচারীদের প্রমোশন তো আটকে থাকবে না। ঠিকেদার-প্রোমোটারদের নাফাও বন্ধ থাকবে না। অথচ প্রকল্প শেষ পর্যন্ত বাতিল হল। তাহলে বন্ড ক্রেতাদের কি হবে?

এজন্য অবশ্যি খানিক আশ্বাস বিজ্ঞাপনটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তবে খুবই ছোট ছোট অক্ষরে। প্রায় পড়া যায় না এমনভাবে। বলা হয়েছে যথেষ্ট সংখ্যক বন্ড-ক্রেতা না পাওয়া গেলে যারা ইতিমধ্যেই কিনে ফেলেছেন তাদের টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। —অতএব যে কজন বন্ড কিনবেন কিছুটা নিশ্চিত মনেই কিনতে পারেন।

কথায় বলে না (?) 'ডেভিলস্ ডেয়ার হোয়্যার এ্যাঞ্জেলস্ ফিয়ার টু ট্রেড'। পরিকল্পনাকারদের হয়েছে সেই অবস্থা। সম্প্রতি সুরজিত সিন্‌হা মহাশয় 'নর্মদা বাঁধ' প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধের শুরুতে এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করেছেন।—যথার্থই বলেছেন সিংহ মশাই।

পুনশ্চঃ জানা গেল 'নর্মদা' বেচে দু পয়সা কামিয়ে নেবার আশায় বাদ সেধেছেন জনা দুই লগ্নিকারী। তাঁদের বক্তব্য, বন্ডের বিজ্ঞাপনে যে আকর্ষণীয় তথ্যাদি দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ তাতে যথেষ্ট কাঁচা মিথ্যাভাষণ রয়েছে, এবং এ ব্যাপারে তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। □ রঃ চঃ

বন্ধ রুগ্ন কল-কারখানা সংক্রান্ত পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন—

নাগরিক মঞ্চ

134, রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড।
রুম নং—7 ব্লক-বি।
কলিকাতা—700085

27/11/93 তারিখে প্রকাশিত একটি খোলা চিঠি আমাদের হাতে আসে। **বক্তব্য নিম্নরূপ :**

সরিষা হাইস্কুলে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন নিয়ে একাধিক শিক্ষকের স্কুল বিল্ডিং-এ টাকার বিনিময়ে প্রাইভেট টিউশনের ঘটনায় আমরা যারপরনাই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত। দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষক তথা বিল্ডিং কেয়ারটেকারের উদ্যোগে স্কুল বিল্ডিং-এ এই বেআইনী প্রাইভেট টিউশন চলছে। স্কুল বিল্ডিং-এ স্কুলেরই মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষকের এই চরম বেআইনী, অনৈতিক ও বৈষম্যসৃষ্টিকারী কাজকে আমরা তীব্রভাবে নিন্দা করছি।

বিস্ময়ের ব্যাপার হল, একদিকে যখন স্কুল বিল্ডিং-এ শিক্ষকদের টাকা নিয়ে প্রাইভেট টিউশনের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে ঠিক তখনই স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরীক্ষা প্রস্তুতির স্বার্থে পুজার ছুটি, গরমের ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির দিনে স্কুলে প্রয়োজনীয় ফ্রি কোচিং ক্লাস নিতে ইচ্ছুক শিক্ষকদের ও উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য আবেদনকে নাকচ করছেন ম্যানেজিং কমিটি। ছাত্র-ছাত্রী তথা অভিভাবকদের বৃহত্তর স্বার্থে এবং স্কুলের শিক্ষাগত মান ও পরীক্ষার রেজাল্টের উন্নয়নের স্বার্থে এই ধরনের ফ্রি কোচিং ক্লাসের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

অবিলম্বে স্কুল বিল্ডিং-এ শিক্ষকদের টাকা নিয়ে প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করতে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য ইচ্ছুক শিক্ষকদের মাধ্যমে ফ্রি কোচিং ক্লাস চালু করার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। □

খোলা চিঠিটি প্রকাশিত হয় শিক্ষক-অভিভাবক তথা নানান পেশার বহু মানুষের পক্ষ থেকে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে দেবাশিস চৌধুরি নামে একজন শিক্ষক এ ব্যাপারে ঢিল ছুঁড়েছেন টিউশন ব্যবসার মৌচাকে। স্বভাবতই তাঁকে বিপদে পড়তে হচ্ছে। চাপ আসছে কায়েমী স্বার্থের সমস্ত মহল থেকেই। মোটেই না দমে তিনি গত 5 ডিসেম্বর হাইকোর্টে গিয়েছেন। ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের বিনিপয়সায় পড়ানর অধিকার প্রার্থনা করেছেন ন্যায়ালয়ের কাছে, আইনী ব্যবস্থা চেয়েছেন কর্মরত শিক্ষকদের টিউশন ব্যবসা বন্ধ করার জন্য। দাবী করেছেন এই ব্যবসার জন্য স্কুল-কলেজের বিল্ডিং ব্যবহার বেআইনী ঘোষণা করা হোক। আমরা জানি যে এসব দাবী নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলে দেবাশিসের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। তাই আমাদের আবেদন—এগিয়ে এসে দেবাশিসকে সমর্থন করুন। জনমত গড়ে তুলুন শিক্ষাক্ষেত্রকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার জন্য :

* সবশেষে খবর পাওয়া গেল, দেবাশিস প্রহৃত হয়েছেন ক্লাসঘরের মধ্যেই। এ ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগ. সমবেদনা রইল শিক্ষক দেবাশিসকে ঘিরে।

যোগাযোগ—দেবাশিস চৌধুরি,
নিউ টাউন, ডায়মণ্ড হারবার,
দক্ষিণ 24 পরগণা, পিন—743 331

আর এন 34929/79
ষষ্ঠদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারী—মার্চ '94

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী
প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী
পি 252, লেক টাউন,
ব্লক এ, কলিকাতা-89, পিন-700089

* 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে ঠিক সময়ে উপযুক্ত বিষয়বস্তু সহ প্রকাশিত হতে সাহায্য করুন।

* লেখা পাঠান—'উন্নয়ন' কে ঘিরে বিতর্ক বা পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রচনা—গণস্বাস্থ্য বা নিউক্লিয়ার শক্তি সব কিছুই বি ও বি সাদরে গ্রহণ করবে। বিশেষ অনুরোধ—স্থানীয় সমস্যা ভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান বা সমীক্ষার জন্য বি ও বিতে নিয়মিত বিভাগ রাখা হচ্ছে। এই বিভাগে লেখা পাঠান।

* গ্রাহক হোন, কাছের মানুষদের গ্রাহক হতে সাহায্য করুন। একটি ছোট্ট উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার সহযোগিতা খুবই জরুরী।

যাঁরা কাজ করেছেন—কম্পোজ □ গীতশ্রী সেন, স্বপন সেন ।। মেক আপ □ স্বপন সেন ।। মেশিনম্যান □ কালীবাবু ।। বাইণ্ডিং □ লক্ষণ দাস ।। মুদ্রক □ সমুদ্র ঘোষ।

বি ও বির পক্ষ থেকে—স্বাতী, বনশ্রী, নিত্যানন্দ, সত্যব্রত, অসীম, শেখর, রবীন মজুমদার।

প্রচ্ছদ □ রবীন চক্রবর্তী, অলক।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল প্রেসের পক্ষে প্রিণ্টিং পাবলিসিটি, 117, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-9 থেকে মুদ্রিত।